KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ৩নং হরিঘোষ স্ট্রীট, কলকাতা
Collection : KLMLGK	Publisher : প্রমথ চৌধুরী
Title : সবুজ পত্র (SABUJ PATRA)	Size : 7.5"x6"
Vol. & Number : 4/6-7 4/8 4/9 4/10 4/11 4/12	Year of Publication : বৈশাখ-আষাঢ় ১৩২৪ শ্রাবণ-আশ্বিন ১৩২৪ কার্তিক ১৩২৪ অগ্রহায়ণ ১৩২৪ পৌষ ১৩২৪ ফাল্গুন ১৩২৪ চৈত্র ১৩২৪
	Condition : Brittle / Good
Editor : প্রমথ চৌধুরী	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

শক্তিমানের ধর্ম্ম।

—:০:—

"সদর বড় না অন্দর বড় ?"—"মানুষের বাহিরটা বড় না তার ভিতরটা বড় ?"—এই হচ্ছে "কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম" আর "বুদ্ধিমানের কর্ম্ম" এই দুটোর মধ্যে আসল তর্কটা। হিন্দুর পক্ষে কি তার রাষ্ট্রীয় অবস্থা, কি তার সামাজিক ব্যবস্থা এ দুটোর কোনটাই যে বর্ত্তমানে তেমন মোলায়েম নয় তা রবীন্দ্রনাথও বলেন আর বিপিন বাবুও মানেন—কিন্তু যত মতভেদ সে শুধু এর কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ নিয়ে—cause ও affect নিয়ে। রবীন্দ্রনাথ বল্‌ছেন—সমাজটা হচ্ছে ঘোড়া আর রাষ্ট্রটা হচ্ছে গাড়ী। এই সমাজ-ঘোড়া বলিষ্ঠ ও মুক্ত না হলে' সে ঐ রাষ্ট্র-গাড়ীকে টান্‌তে পারবে না। বিপিন বাবু বল্‌ছেন—Oh no, I beg your pardon that is—রাষ্ট্রটাই হচ্ছে ঘোড়া আর সমাজটা হচ্ছে গাড়ী—রাষ্ট্র-ঘোড়া শক্ত না হলে সমাজ-গাড়ী চিরকাল তক্তা হ'য়েই কাল কাটাবে।

রাষ্ট্রের তুলনায় মানুষের সমাজটা তার অন্দর। আবার সমাজের তুলনায় মানুষের মনটা তার অন্দর। রবীন্দ্রনাথ বল্‌ছেন—এই মন-অন্দরের উপরে আমরা শত সহস্র নিষেধের ঘোমটা টেনে দিয়ে, অক্ষমতার সুতোয় বোনা এমনি কালো পুরু আরামের পর্‌দা টাঙিয়ে দিয়েছি যে রাষ্ট্রের মুক্ত হাওয়া আর সেখানে আস্‌তে পারছে না। বিপিন বাবু বল্‌ছেন—Fiddlesticks—বাজে কথা। রাষ্ট্রের হাওয়াটা এসে পড়ুক ও ঘোম্‌টা টোম্‌টা কোথায় উড়িয়ে নিয়ে যাবে।

এই মতভেদের মূলে একটা philosophy-র ভেদ আছে। রবীন্দ্রনাথ বল্‌ছেন—মানুষের ভিতরটা দিয়ে তার বাহিরটা নিয়ন্ত্রিত হয়। আর বিপিন বাবু বল্‌ছেন—মানুষের বাহিরটা দিয়েই তার ভিতরটা গড়ে' ওঠে। অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথের মতে আমাদের আত্মাটা আমাদের দেহটাকে গড়ে' তুলেছে। অপরপক্ষে বিপিন বাবুর মতে আমাদের দেহটাই আমাদের আত্মার জন্ম দিয়েছে। এ মত শুনে হিন্দু-দর্শনের প্রতি যার কিছুমাত্র শ্রদ্ধা আছে তারই চক্ষুস্থির হবে নিশ্চয়। কিন্তু "কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম" আর "বুদ্ধিমানের কর্ম্ম" এ দুটোর আসল অমিলটা হচ্ছে ঐ গোড়ার কথায়।

রবীন্দ্রনাথ আমরা আজ যে অবস্থায় এসে পৌঁছেছি তার জন্যে দায়ী কর্‌তে চান আমাদের নিজেকে। আর বিপিন বাবু তার জন্যে দোষী করতে চান মহম্মদ গজনি সাহেব ও জন্ কোম্পানীকে। এই নিয়েই ত তর্ক।

শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী গত শ্রাবণের "সবুজ পত্রে" "প্রাণের কথা" প্রবন্ধে লিখেছিলেন যে উদ্ভিদ পশু আর মানুষ এ তিনের তিনটী পৃথক বিশেষ-ধর্ম্ম আছে। উদ্ভিদের স্থিতি—পশুর গতি—আর মানুষের মতি। উদ্ভিদসম্বন্ধে তিনি লিখেছিলেন যে, "উদ্ভিদ নিশ্চল অতএব তা পারিপার্শ্বিক অবস্থার একান্ত অধীন। প্রকৃতি যদি তাকে জল না জোগায় ত সে ঠায় দাঁড়িয়ে নির্জ্জলা একাদশী করে' শুকিয়ে মরতে বাধ্য।" বিপিন বাবু আমাদের এই উদ্ভিদের ক্যাটিগরিতে ফেলতে চান। এতে আশা করি নব্য বাংলার অন্ততঃ নবীন ও তরুণ যাঁরা তাঁদের অনেকেই মনে মনে আপত্তি করবেন।

(২)

বিপিন বাবু একজন সুতার্কিক। কিন্তু তিনি তাঁর মতের সত্যতা প্রতিপন্ন করবার জন্যে যে-সব প্রমাণ দাখিল করেন সে-সব প্রমাণের আড়াল থেকে অনেক সময় একটা unconscious humour উঁকি মারতে থাকে। কারণ তিনি যে-সব প্রমাণ দিয়ে যে-সব সিদ্ধান্ত প্রতিপন্ন করতে চান—ঠিক সেই সব প্রমাণ দিয়ে তার উল্‌টো সিদ্ধান্তটাও সমর্থন করা যায়। কারণ প্রমাণের আসল মজাটা ত প্রমাণের মধ্যে নেই—সেটা আছে তার প্রয়োগের বাহাদুরীতে। বিশেষতঃ প্রমাণ জিনিসটার মতো মুক্তজীব এ জগতে আর দুটী নেই। প্রমাণ ঐতিহাসিক ঘটনার পোষাক পরে' ভারী ভারী বড় বড় চিন্তার আশা-শোটা কাঁধে চড়িয়ে যে-কোন সত্য-মহারাজের পাছে পাছে একই রকম গাম্ভীর্য্যের সঙ্গে চলে—আজকার সত্য-মহারাজ যদি কালকার সত্য মহারাজের ঘোর বিরুদ্ধও হয়, প্রমাণ-আরদালীর তার প্রতিও সমান খাতির। তাই বুদ্ধের নির্ব্বাণতত্ত্বের পিছনেও প্রমাণ, শঙ্করের মায়াবাদের পিছনেও প্রমাণ, আবার চৈতন্যের ভক্তিবাদের পিছনেও প্রমাণ। এই প্রমাণের যখন এমনি জোর তখন আমরা বিপিন বাবুরই দেওয়া প্রমাণ দিয়ে তাঁর বিরুদ্ধ মতটাও যে কি করে' সমর্থন করা যায় তার একটা উদাহরণ এখানে দিচ্ছি।

বিপিন বাবু লিখছেন—সে লেখার ক্রিয়াপদগুলোর রূপান্তর ঘটিয়ে ও জায়গায় জায়গায় দু একটী শব্দ বসিয়ে হুবহু তুলে দিচ্ছি—বিপিন বাবু লিখছেন যে—

চৈতন্যদেব স্পষ্টভাবে ভগবান ভাষ্যকারের বিবর্ত্তবাদ খণ্ডন করে' পরিণামবাদ স্থাপন করেন। এই পরিণামবাদে জগৎ ও জীবকে পরিণামী নিত্য বলে'

প্রতিষ্ঠা করা হ'ল। অথচ মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ও সংসার-জীবনে এই মারাত্মক মায়ার হাত থেকে এড়িয়ে যেতে পারলেন না। লোকে বৈষ্ণব-মন্ত্রে দীক্ষা নিলে, বৈষ্ণবগুরু কর্‌ল, বৈষ্ণব-শাস্ত্র পড়ল; কিন্তু এই জগৎকে ও জগতের বিবিধ সম্বন্ধকে সত্যবোধে ধর্ম্মের প্রেরণায়, মুক্তি কামনায়, পরমার্থ দৃষ্টিতে দেখে আঁকড়িয়ে ধরতে পারল না। এরা ভগবান মান্‌ল; ভগবতীলীলার কথা কইতে লাগল; ক্ষণজন্মা সাধু মহাজনেরা ভগবতী-তনু লাভ করে' ইহজীবনে ও ইহলোকেই সেই নিত্য ভগবতীলীলার অনুসরণ করতে পারেন এও বিশ্বাস কর্‌ল; কিন্তু তবু এই সংসারের প্রত্যক্ষ সেবার, প্রেমের রসের সম্বন্ধের মধ্যেই যে দেশকালের রঙ্গমঞ্চে ভগবানের নিত্যলীলার নিত্য অভিনয় হচ্ছে * * * * এ সব কথা ধর্‌তে ও বুঝতে পারল না।"

তারা আবার ঘুরে ফিরে "মায়াবাদী বৈদান্তিক যে ভাবে এই সংসারকে মায়িক বা অলীক বলে' উপেক্ষা করে' আসছিলেন" ঠিক তেমনি করতে লাগল।

এই কি একটা মস্ত প্রমাণ নয় যে সত্য কাউকে হজম করিয়ে দেওয়ার শক্তি মহাপুরুষেরও নেই, যদি না তার সে সত্যকে হজম করবার শক্তি থাকে? যে সত্য মানুষের অন্তরে সত্য হ'য়ে না উঠেছে সে সত্য তার বাহিরে ব্যর্থ হবেই? কিন্তু বিপিন বাবু বল্‌ছেন যে রাষ্ট্রীয়-জীবনে তখন আত্মপ্রতিষ্ঠার পথ একরূপ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বলেই অন্তরের ঐ সত্য বাহিরে আপনাকে সার্থক করে' তুল্‌তে পারে নি। সত্যের এক নূতন মূর্ত্তি বটে! যে সত্য শত সহস্র বাধা বিঘ্ন ভেঙে শত সহস্র বিপদ আপদের মাঝ দিয়ে আপনাকে প্রতিষ্ঠা কর্‌তে না পারে সে সত্য কেমন সত্য? যে সত্য কাজীর ভয়েই মূর্চ্ছা যায় সে সত্য কেমন সত্য? সত্যকে কি আমরা

এই রকম বলেই জানি! মানুষের রক্ত মাংস ত্বকের চাইতে—মানুষের জীবনের চাইতে যে মানুষের সত্য বড়—এটা ত জগতের শত সহস্র সত্যসন্ধ লোকের জীবনে কত শতবার প্রমাণ হয়ে গিয়েছে। অথচ বিপিন বাবু বল্‌ছেন যে বৈষ্ণবদের ভিতরের সত্য বাহিরের চাপে আর ফোটারই সুযোগ পেলে না। আসল কথাটা কি এই নয় যে—বৈষ্ণবদের অন্তরে চৈতন্যদেবের শিক্ষা সত্য হয়ে উঠলে বাহিরের চাপে সেটা আরও দীপ্ত হয়ে উঠ্‌ত সুপ্ত হয়ে পড়্‌ত না কিছুতেই। সত্য কথা এই যে চৈতন্যদেব গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়কে পরিণাম-বাদের যে শিক্ষাই দিন না কেন তা তাঁদের অন্তরে সত্য হয়ে ওঠে নি—সে শিক্ষার মন্ত্র মুখে আওড়ালেও অন্তরে তাঁরা সেই শঙ্করের মায়াবাদেরই জের টেনে চলেছিলেন। কাজীর চাপ একটা excuse মাত্র—এই excuse-কে নিমিত্ত, করে' যেটা ছিল তাঁদের পক্ষে আসল সত্য, মায়াবাদ, সেইটেই তাঁদের জীবনটাকে নিয়ন্ত্রিত করেছিল। এই excuse-এর উদাহরণ ইতিহাসে ভুরি ভুরি মেলে। যেমন সেরাজেভোর হত্যাকাণ্ড বর্ত্তমান ইয়োরোপীয় সমরের একটা excuse।

বিপিন বাবু রাষ্ট্রীয়-জীবনে আত্মপ্রতিষ্ঠার পথের কথা তুলেছেন—কিন্তু ভিতরের পথ সত্য হয়ে না উঠলে যে বাহিরের পথ অপথই থেকে যায় তার উদাহরণ আছে সিরাজদ্দৌলার ইতিহাসে। রাষ্ট্রীয়-জীবনে ত তখন আত্মপ্রতিষ্ঠার পথ দিব্যি পরিষ্কার হয়েছিল—কিন্তু হিন্দুরা সে পথ ধরে' চল্‌ল না কেন? কারণ হিন্দুদের অন্তরে আত্মপ্রতিষ্ঠা সত্য হয় নি বলে'। কিন্তু বিপিন বাবুর সিদ্ধান্ত অনুসারে অবশ্য ইংরাজই সব মাটী করেছে—ইংরাজ না থাকলে

নিশ্চয়ই হিন্দুরা আপনার অধিকার পেয়ে যেত। এ হচ্ছে সেই ছেলের মত কথা যে বাপকে এসে বলেছিল—"বাবা আমি পরীক্ষায় সেকেণ্ড হয়েছি।" ছেলের তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্বন্ধে পিতার চির-দিনই একটু সন্দেহ ছিল তাই জিজ্ঞেস করলেন—"ক্লাসে ছেলে ক'জন রে?" ছেলে প্রসন্নমুখে উত্তর দিল—"দু'জন।" কিন্তু সত্যকথা এই নয় কি যে ইংরাজ না থাকলে বাংলার মসনদ অধিকার করে বসত ফরাসীরা,—ফরাসীরা না হলে পর্ত্তুগীজরা, পর্ত্তুগীজ না হলে, দিনেমার ওলন্দাজ আলেমান, যে হোক্ আর কেউ, বস্‌ত না কিছুতেই যারা, সে হচ্ছে উমিচাঁদ, রাজবল্লভ কিম্বা কৃষ্ণচন্দ্র।

বিপিন বাবু বল্‌ছেন যে ফরাসী-বিপ্লবের পর যখন রাষ্ট্রে গনতন্ত্রতার প্রভাব বৃদ্ধি হল তখন থেকে ইয়োরোপে জীবনের সকল ক্ষেত্রে মানুষ মানুষ হ'য়ে ওঠ্‌বার চেষ্টা কর্‌তে আরম্ভ করেছে। একেই ইংরেজিতে বলে—Putting the cart before the horse, আসল কথা হচ্ছে যে মানুষ কতকটা অন্তরে মানুষ হ'য়ে উঠেছিল বলেই, মানব-সভ্যতার নবযুগ ইয়োরোপের মনে আগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলেই, পরে তা ইয়োরোপের জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। "Liberté, egalité, fraternité" সাম্য মৈত্রী-স্বাধীনতার মন্ত্র ফরাসীজাতির অন্তরে সত্য হ'য়ে উঠেছিল বলে'—এ মন্ত্রের বলে' এ সত্যের পরিপন্থী অভিজাতবর্গ ও পুরোহিতসম্প্রদায় ভেসে গেল। এই হ'চ্ছে ও-ব্যাপারের আসল psychology—অন্ততঃ আমার ত সেইরকমই মনে হয়। কারণ আমি সর্ব্বান্তঃকরণে বিশ্বাস করি যে আত্মাটাই মানুষের দেহটাকে গড়ে তুলেছে। আর আজ এই Capital ও Labour-এর মারামারির দিনে এই সত্যটা মনে রাখা ভাল। বিশেষতঃ যখন বীজ আগে না বৃক্ষ আগে—

ডিম আগে না মুরগী আগে—গৌড়ীয় ভাষায় "পাত্রাধার তৈল কিম্বা তৈলধার পাত্র" এ তর্কের শেষ এ জগতে কোন দিন হবার আশা নেই।

(৩)

প্রকৃত ঘটনা এই যে, বুদ্ধিমানের কর্ম্মে আর শক্তিমানের ধর্ম্মে একটা আকাশ পাতাল প্রভেদ আছে। এদের দুজনের চলার ভঙ্গীই আলাদা। বুদ্ধিমান চলে পিঠ বেঁকিয়ে—আর শক্তিমান চলে বুক ফুলিয়ে। তার কারণ হচ্ছে এই যে এই দুজন এ জগতটাকে দেখে দুরকম। দুজন ত একই জগতে বাস কর্‌ছে। তারপর যদি কেউ বুদ্ধিমান আর শক্তিমানের চোখ পরীক্ষা করে' দেখেন তবে দেখ্‌তে পাবেন যে তাদের দু'জনের চোখ এক রকম উপাদান দিয়েই তৈরী। এ সত্ত্বেও দু'জন একই জিনিসকে দু'রকম দেখে কেন? কারণ তাদের দু'জনের মন দু'রকম। অর্থাৎ তাদের ভিতরটা এক নয় বলে'। আর বাহিরটা ভিতরটারই প্রতিবিম্ব—অর্থাৎ Reflection.

বুদ্ধিমান মনে করে যে সে যে বেঁচে আছে সেটা কেবল তার বুদ্ধির জোরে, নইলে আকাশের মশা থেকে আরম্ভ করে' দেয়ালের টিক্‌টিকীটা পর্য্যন্ত ত তাকে মারবার ফন্দিতেই ফিরছে! তাই তার সারা জীবনটা মরণটাকে ফাঁকি দেবার ফিকির কর্‌তেই কেটে যায়। আর শক্তিমান মনে করে যে একবার যখন সে জন্মেছে তখন বেঁচে থাকাটা তার হক্ Birth-right, আর বলে যে—যদ্দিন বেঁচে আছি তদ্দিন পৃথিবীটাকে কসে' বুঝিয়ে দেব যে বেঁচে আছি। শক্তিমান বলে—মশা টিক্‌টিকী আমাকে মার্‌তে পারে কিন্তু আমাকে ছোট কর্‌তে পারে না। তাই

শক্তিমান সহস্রবার মর্‌তে রাজি কিন্তু একটী বারও ছোট হ'তে রাজি নয়।

তাই বুদ্ধিমানের নৌকা যখন ডুব্‌ল তখন সে প্রচুর গবেষনা করে বের কর্‌লে যে মঘা-নক্ষত্রে নৌকো ছাড়া হয়েছিল বলেই তার নৌকো ডুব্‌ল। তারপর থেকে সে নৌকো ছাড়্‌তে লাগ্‌ল মঘাকে পেরিয়ে। শক্তিমান বল্‌লে যে—মঘা যদি আমার নৌকো ডুবিয়ে থাকে তবে এমন নৌকো তৈরী কর্‌ব যে অন্ততঃ চার শ' মঘার দরকার হবে সে নৌকাকে ডোবাতে। তাই বুদ্ধিমানের নৌকো আজও পাল তুলেই আর গুণ টেনেই চলছে—কিন্তু শক্তিমানের নৌকো আজ যা দাঁড়িয়েছে তার সঙ্গে তার পিতৃপিতামহের নৌকোর প্রকারগত সাদৃশ্য থাক্‌লেও আকারগত সাদৃশ্যও নেই আচারগত সাদৃশ্যও নেই।

যখন প্রথম এরোপ্লেন নিয়ে experiment আরম্ভ হয় তখন ফ্রান্সে যে সেই ব্যাপারে কত লোক মরেছে তার ঠিক নেই। কেউ বা দু'শ হাত কেউ বা চার শ' হাত—কেউ বা হাজার ফিট দু'হাজর ফিট চার হাজার ফিট ওঠে—তারপর এঞ্জিন খারাপ হয়ে যায়—সঙ্গে সঙ্গে এরোপ্লেন সমেত মানুষ ধরাশায়ী—তারপর মৃত্যু—বিশ্রী রকমের সে মৃত্যু! ফ্রান্স যদি অতিরিক্ত পরিমাণে বুদ্ধিমানের দেশ হ'ত তবে ঐ রকমের দু'এক জনের মৃত্যুর পর নিশ্চয় এরোপ্লেনকে নিজের পাততাড়ি গুটিয়ে অন্যত্র যাবার চেষ্টা দেখ্‌তে হত। সঙ্গে সঙ্গে এমন শ্লোকও রচনা হ'য়ে যেত, যাতে স্পষ্ট করে' লেখা থাক্‌ত যে আকাশে ওঠাটা আধ্যাত্মিক জীবন লাভের পরিপন্থী—এবং সঙ্গে সঙ্গে তার এমন ভাষ্যকারেরও আমদানী হ'ত, যিনি স্পষ্টতর করে' বলে দিতেন যে ঐ শ্লোকের অর্থই হচ্ছে এই যে যে-কেউ আকাশে উঠ্‌বে তার ঊর্দ্ধতন

সাড়ে সাতাত্তর পুরুষের গতি হবে রৌরবে—আর বুদ্ধিমান স্পষ্টতম করে' দেখ্‌তে পেত যে তাদের মতো বুদ্ধিমান আর দুনিয়ায় দুটী নেই। কেবল তাই নয়। কেউ কেউ আবার যৌগিক বলে সূক্ষ্মদৃষ্টি লাভ করে' এ পর্য্যন্ত দেখ্‌তে পেত যে আকাশে একটা প্রকাণ্ড দৈত্য বসে' রয়েছে, যে-কেউ আকাশে উঠ্‌বে তার ঘাড় মট্‌কাবার জন্যে। আর তারপর যদি ঐ উপরি-উক্ত শ্লোকটী অনুষ্টুপ ছন্দে রচিত হয়—তবে ত পোয়াবার। বুদ্ধিমান তখন পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে দিব্যি আরামে ঐ শ্লোক আওড়িয়ে সেই বিরাট দৈত্যকে একটা ভরাট নৈবেদ্য দিয়ে পূজা কর্‌তে লেগে যেত। আর সঙ্গে সঙ্গে ভাব্‌ত যে এ পৃথিবীতে সূক্ষ্মদৃষ্টিটা তাদের কপালেই খালি মিলেছে।

কিন্তু ফ্রান্স শক্তিমানের দেশ। তারা দু'দশ জনের মরণটাকে কেয়ারই কর্‌লে না। ক্রমে ক্রমে দেখা গেল যে যত দিন যেতে লাগ্‌ল সেই দৈত্যটার মানুষের ঘাড় মটকাবার ক্ষমতাটা তত কমে আস্‌তে লাগ্‌ল। অবশেষে যখন শ'চার পাঁচেক মানুষের জীবন দিয়ে এরোপ্লেনটার পূর্ণ প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়ে গেল তখন দৈত্যটাও একেবারে অদৃশ্য হ'য়ে গেল। চার শ' ফরাসী মরে' চার কোটী ফরাসীকে বাঁচিয়ে গেল। মানুষ মর্‌ল বটে কিন্তু মনুষ্যত্ব বেঁচে গেল।

এখন বুদ্ধিমানের হাজার সূক্ষ্মদৃষ্টি সত্ত্বেও যে জিনিসটা সে কিছুতেই বুঝে উঠ্‌তে পারে না সেটা হচ্ছে এই যে, ঐ যে চার পাঁচ শ' লোক মর্‌ল ওরা ও-রকম গোঁয়ার্ত্তুমি করে' মর্‌তে গেল কেন? তাতে তাদের কি লাভ? উত্তরমেরু আবিষ্কার নাই বা হ'ল?—তার আসল কেন্দ্রটা জ্যামিতিক ম্যাপের হিসেবে ঠিক নাই বা জান্‌লেম—তাতে ক্ষতিটা কি? এ কি রকম মানুষের আজগুবি সখ! এই যে বুদ্ধিমান

শক্তিমানকে বুঝ্‌তে পারে না তার কারণ হচ্ছে যে তাদের দু'জনের অন্তর এক নয়। শক্তিমান নিজের অন্তরে যে প্রাণের স্পন্দন অদম্য বেগে পাচ্ছে, বুদ্ধিমান তা পাচ্ছে না। অন্তরের এই পার্থক্যের জন্যই তাদের বাহিরেও কর্ম্মের এই পার্থক্য দাঁড়িয়ে যায়। কারণ মানুষের বাহিরের কর্ম্ম তার অন্তরের ধর্ম্মেরই অনুবাদ—অর্থাৎ translation.

বুদ্ধিমান ও শক্তিমানের অন্তরে এই যে পার্থক্য—এ পার্থক্যের আসল নিগূঢ়তম কারণটী কি? এ সম্বন্ধে যা বুঝি সেটা বল্‌ছি।

(৪)

সৎ, চিৎ, আনন্দ—এটা হচ্ছে মানুষের কথা। ভগবান যদি দর্শন লিখ্‌তে বসে' যেতেন তবে তিনি ঐ ফরমূলাকে উল্‌টে দিয়ে লিখ্‌তেন—আনন্দ, চিৎ, সৎ। কারণ গোড়ার কথা আনন্দ—তারপর শক্তি—তারপর সৃষ্টি। আনন্দ থেকে প্রকাশ হয়েছে শক্তি—শক্তি থেকে উদ্ভূত হয়েছে সৃষ্টি। এই হচ্ছে সৃজনলীলার মূলতত্ত্ব। আর মানুষের জীবনেও এই তত্ত্বই কার্য্যকারী হ'য়ে রয়েছে। শক্তিমান ও বুদ্ধিমানের নিগূঢ়তম প্রভেদটা হচ্ছে ঐ আনন্দ নিয়ে। শক্তিমানের অন্তরে আনন্দ আছে—বুদ্ধিমানের তা নেই। অন্তরে ঐ আনন্দ আছে বলে' শক্তিমান তার বেঁচে থাকার মধ্যে অমৃত পায়। বুদ্ধিমানের ঐ আনন্দ নেই বলে' সে তার বেঁচে থাকার মধ্যে খুঁজে বেড়ায় আরাম। এই যে জীবনের আনন্দ—বেঁচে থাকার আনন্দ—এই আনন্দের রীতিই হচ্ছে গতিতে—বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে—রূপ থেকে রূপান্তরে—রস থেকে রসান্তরে—এক কথায় এই আনন্দের

ধর্ম্ম হচ্ছে Multiplication—Subtraction নয়। সেই জন্যে এই আনন্দ প্রাণে প্রাণে অন্তরে অন্তরে অনুভব করে' শক্তিমানের যে মানসিক ভাব দাঁড়ায় সেটা বাংলায় তর্জ্জমা কর্‌লে কতকটা দাঁড়ায় এই রকম—

সব কাজে হাত লাগাই মোরা সব কাজেই।
বাঁধা বাঁধন নেই গো নেই।
দেখি, খুঁজি, বুঝি,
কেবল ভাঙি, গড়ি, যুঝি,
মোরা সব দেশেতেই বেড়াই ঘুরে সব সাজেই।
পারি, নাই বা পারি,
না হয় জিতি কিম্বা হারি,
যদি অম্‌নিতে হাল ছাড়ি মরি সেই লাজেই।
আপন হাতের জোরে
আমরা তুলি সৃজন করে,
আমরা প্রাণ দিয়ে ঘর বাঁধি, থাকি তার মাঝেই।

এই যে, দেখা, খোঁজা—তাতে শক্তিমান যাই পাক্, এই যে ভাঙা গড়া তাতে শক্তিমান যাই গড়ে' তুলুক—তাইই তাকে সার্থকতা মিলিয়ে দেয়—কারণ জিনিসের সার্থকতা ত জিনিসের মধ্যে নেই আছে তা মানুষের অন্তরে। বেঁচে থাকার এই আনন্দের জন্যই শক্তিমান উত্তর-মেরু আবিষ্কার করতে ছোটে—এমন কি নিশ্চিত মরণও তাকে ঠেকিয়ে রাখ্‌তে পারে না। কারণ আনন্দ যেখানে আছে মরণও সেখানে অমৃতময় হ'য়ে ওঠে। ঠিক এই কারণেই ইয়োরোপ অদম্য ভোগের স্রোতে আপনাকে ভাসিয়ে দিয়েও মর্‌তে ভয় পায় না—কিন্তু আমরা

জীবনটা নশ্বর নশ্বর করে' কাটিয়েও টিক্‌টিকিটীকে পর্য্যন্ত সমিহ করে' চলি। অন্তরে এই আনন্দ আছে বলে' শক্তিমান এরোপ্লেন নিয়ে আকাশে ওঠে। তা সে মরুকই আর বাঁচুকই। এই যে সে এরোপ্লেনে ওঠে সেটা সে কর্ত্তব্য বোধে করে না—তার জাতীয় জীবনের পক্ষে শ্রেয় বলে' করে না। ও-সব হচ্ছে পাটোয়ারী বুদ্ধির লাভ ক্ষতির হিসেব। লাভ ক্ষতি একটা accident মাত্র। আসল কথা হচ্ছে তার অন্তরের ঐ আনন্দ। কর্ত্তব্য-বোধে শ্রেয় জ্ঞানে মানুষ যা করে তা সে দু'দিন করতে পারে, কিন্তু চিরকাল পারে না। কারণ যেখানে শুধু কর্ত্তব্য সেখানে কেবল দাসত্ব। যতদিন না শ্রেয়টা মানুষের জীবনে প্রেয় হ'য়ে উঠেছে, যতদিন না মানুষের কর্ত্তব্য তার অন্তরের আনন্দ নিয়ে অমৃতময় হয়ে উঠেছে—ততদিন মানুষের জীবন ব্যর্থই হবে—তার ভিতরেও বাহিরেও। এই জন্যই বুদ্ধিমান শক্তিমানের উত্তরমেরু আবিষ্কার বুঝতে পারে না। তার "গোঁয়ার্ত্তুমি" "আজ্‌গুবি" সখের" মানে অভিধান খুলেও পায় না—পঞ্জিকা খুঁজেও পায় না।

এই যে আনন্দ—এটা মানুষের অতি সহজলভ্য। তেমনি সহজলভ্য যেমন সহজলভ্য তার নিশ্বাস নেবার বাতাস। ভগবানের সঙ্গে মানুষের সর্ত্তই হচ্ছে এই যে, সে ভগবানের জগত-লীলায় সঙ্গী হয়ে থাকবে যদি ভগবান তার অন্তরের জীবন-দেবতাকে আনন্দময় করে' রাখে। মানুষ যখন তার এই অন্তরের আনন্দ থেকে বঞ্চিত হয় তখন ভগবানকে সে নোটিশ দেয়—বলে—ভগবান চল্লেম আমি তোমার এই জগৎ থেকে। তখন সে মায়াবাদ প্রচার করতে লেগে যায়—নির্ব্বাণ মুক্তির পথ খুঁজে বেড়ায়। কেউ কেউ আবার কতগুলো

অস্বাভাবিক প্রক্রিয়াদ্বারা এই আনন্দকে ধরতে চায়। এই অস্বাভাবিক প্রক্রিয়াগুলোরই আমরা নাম দিয়েছি—হঠযোগ, রাজযোগ ইত্যাদি। কিন্তু কথা হচ্ছে স্বাভাবিক স্বাস্থ্যের জোরে ফুর্ত্তি করে' বেড়ান এক কথা আর বোতল বোতল "এসেন্স অফ নিম" খেয়ে স্বাস্থ্য রক্ষা আর এককথা।

এই হচ্ছে বুদ্ধিমান ও শক্তিমানের অন্তরের পার্থক্যের নিগূঢ়তম কারণ। শক্তিমানের জীবনে বেঁচে থাকার যে স্বাভাবিক সহজলভ্য আনন্দ তা আছে—বুদ্ধিমানের তার অভাব। ঐ আনন্দ থেকে বঞ্চিত হ'য়ে বুদ্ধিমান বুদ্ধিমান হয়েছে—আর ঐ আনন্দকে বুকে করে' শক্তিমান শক্তিমান। বলা বাহুল্য আমরা এই বুদ্ধিমানের দলের লোক—আর বর্ত্তমান ইয়োরোপ শক্তিমান লোকের দেশ।

(৫)

এখন আমাদের এই গোড়া থেকে আরম্ভ করতে হবে, আগা থেকে নয়। কারণ কেউ কোনকালে ছাদ থেকে আরম্ভ করে' কোন ইমারত খাড়া করে' তুলেছে এ-খবর কোন দেশের বা কোন জাতির ইতিহাসেই আমরা পাই নি। যতদিন না আমাদের জীবন-দেবতার মন্দিরে বেঁচে থাকার আনন্দ প্রতিষ্ঠা হয়ে উঠবে ততদিন আমরা আমাদের বাহিরের কিছুকেই সত্য করে' পাব না—আর যেটাকে সত্য করে" পাব না সেটা আমাদের বোঝা হয়েই উঠ্‌বে। আর আমরা যে যে-কোন বোঝাকে মন্ত্র পড়ে' শূন্য দিয়ে গুণ করে' নির্ব্বাণ পাইয়ে দিতে পারি তার প্রমাণ আমাদের জাতীয় জীবনের "অপ্রাচীন দার্শনিক যুগে"র দর্শনের পৃষ্ঠায় স্পষ্ট করে' লেখা আছে।

তাই প্রথমে আমাদের মানুষকে গড়ে' তুল্‌তে হবে। মানুষের মন

তৈরী কর্‌তে হবে—রাজনীতিকে নয়। কারণ মানুষই রাজনীতি গড়ে' তোলে—রাজনীতি মানুষ তৈরী করে না। নইলে ঘটনাক্রমে যদি বা আমরা স্বায়ত্ত-শাসন পেয়েই যাই তবে আমরা সেই গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের মতোই কর্‌ব। হয়ত আমরা দু'দিন বাদে আমাদের ব্যবস্থাপক-সভার মজ্‌লিসে খোল কর্‌তাল নিয়ে হরিসংকীর্ত্তনের আখ্‌ড়া খুলে বস্‌ব।

অবশ্য বিপিন বাবু আশ্বাস দিয়েছিলেন যে হিন্দুর যখন নৌবাহিনী গড়ে' উঠবে তখন আর সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ হয়ে থাকবে না। যেন সমুদ্রযাত্রাটা কেবল জলযুদ্ধ করবার জন্যেই দরকার—যেন এর আর কোন প্রয়োজন নেই। উপরন্তু যেটা নিষ্প্রয়োজনে করবার হুকুম নেই—মানুষ চিরজীবন ভরে' যেটা এড়িয়ে চলেছে—সেটা যে একদিন সে প্রয়োজনের তাগিদে এক লাফে করে' ফেলবে—তা খালি রূপ-কথার দেশেই সম্ভব—রক্তমাংসের দেশেও সম্ভব নয়—জ্ঞান-বিজ্ঞানের দেশেও সম্ভব নয়। কিন্তু যা হোক্ এখনও বাংলার সুদূর পল্লীতে পল্লীতে এমন অনেক গোঁড়া হিন্দু আছেন যাঁদের অন্তর বিপিন বাবুর ঐ আশ্বাস-বাণী শুনে চম্‌কে উঠবে। তাঁদের সান্ত্বনার জন্যে বল্‌ছি যে তাঁরা নিশ্চিন্ত থাকুন। যতদিন সমুদ্রযাত্রার নাম শুনে তাঁদের অন্তর এমনি চম্‌কে উঠবে ততদিন হিন্দুর নৌবাহিনী গড়ে' ওঠবার কোন সম্ভাবনারও সম্ভাবনা নেই। আর যদি বা জন কয়েক স্বধর্ম্মদ্রোহী স্বেচ্ছাচারী কাণ্ডজ্ঞানহীনের বিশ্বাসঘাতকতায় কোন নৌ-বাহিনী সত্য-সত্যই গড়ে' ওঠে তবে সে জন কয়েকের ছাপ্পান্ন পুরুষের সাধ্য হবে না যে তাঁদের মধ্যে কাউকে সেই নৌ-বাহিনীর এ্যাড্‌মির‍্যালের পদে অভিষিক্ত করা।

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

সুর ও তাল।

"সঙ্গীতের মুক্তিতে" আনাড়ি-গায়কদলের রাস্তা যখন খুলে দেওয়া হল, তখন ভেবে দেখা উচিত ছিল যে অবশেষে তাল সামলে ওঠা দায় না হয়ে পড়ে। রাস্তা যখন খুলেছে, তখন আর তারা বাগ মানে না। ওস্তাদ-ভীতিটা এতদিন বুকের উপর ঠাণ্ডা পাথরের মত চেপে ছিল;—আনন্দের দু' একটা তপ্ত উচ্ছ্বাস বের হবামাত্র সে পাথরের সংস্পর্শে এসে condensed হয়ে ফিরে আসত। পাথর যখন অপসারিত হল, তখন উচ্ছ্বাসগুলি বাধামুক্ত; তপ্ত বলেই তাতে কোনো ভয় নেই, কেননা আধুনিক স্বাস্থ্যতত্ত্ব অনুসারে তপ্ত জিনিস disinfected।

ওস্তাদী গানকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়, কারণ কলা হিসাবে ওর সার্থকতা থাকুক বা না থাকুক,—কৌশল হিসাবে যে রয়েছে, তা স্পষ্টই স্বীকার করা হয়েছে। লেখকের ভাগ্যে যে দু' একজন বড় ওস্তাদ-দর্শন ঘটেছে, তা হতে, তাঁরা যে অসামান্য অত্যাশ্চর্য্য নিপুণতা দেখিয়েছেন, সে সম্বন্ধে নিঃসঙ্কোচে সাক্ষ্য দিতে পারি। "ওস্তাদ-দর্শন" বাক্যটি বাধ্য হয়েই লিখতে হল; তার কারণ, তাঁদের গানের চেয়ে অঙ্গচালনা তাঁদিগকে কম বিশিষ্টতা প্রদান করে না। উৎকটধ্বনি নির্গমনের নিষ্ফল চেষ্টায় হস্তের সঙ্গে কর্ণের ঘনিষ্ঠতার পরিচয় এঁরা বেশ উদগ্রভাবেই দিয়ে থাকেন; তা হতে এরূপ

অনুমান করা সম্ভবত নিতান্ত অসঙ্গত হবে না যে, কর্ণরন্ধ্র বন্ধ হবার অনুপাতে গীতিকৌশল স্ফূর্ত্তি লাভ করে। এতদ্ব্যতীত বৃদ্ধাঙ্গুলি ও তর্জ্জনীর মিলন, মুখ-গহ্বরের আকুঞ্চন, গ্রীবা সঞ্চালন প্রভৃতি—অর্থাৎ মুদ্রাদোষ—ওস্তাদের শাশ্বতরূপ বল্লেই হয়। কিন্তু ওস্তাদের কাছে আসল ভয়টা হচ্ছে তালকাটার ভয়। হাঁটুতে আর আকাশে চপেটাঘাত করে করে কাল কাটালেও, তালকাটা হতে অব্যাহতি লাভ ঘটে উঠতে চায় না।

সঙ্গীতসম্বন্ধে কিছু বলার পূর্ব্বে, তাল জিনিসটা কি, তা সংক্ষেপে একটু বুঝিয়ে বলা আবশ্যক। যাঁর সঙ্গীতের সঙ্গে কিছু পরিচয় আছে, তিনি জানেন যে কাওয়ালি তিন ঠেকা এক ফাঁকের তাল। আবার একতালাও তিন ঠেকা এক ফাঁকের তাল। এতৎ সত্ত্বেও যে দুটিকে দুটি বিভিন্ন নামে অভিহিত করা হয়, তার কারণ তাদের মাত্রা। কাওয়ালী ষোল মাত্রা এবং একতালা বারো মাত্রার তাল। দৃষ্টান্ত দিলে কথাটা পরিষ্কার হবে।

কাওয়ালী।

২ ৩ ০
জা নি | জা ০ নি ০ | কো ন্ আ দি | কা ০ ল হ |

১ ২ ৩ ০
| তে ০ ভা সা | লে ০ আ যা | রে ০ জ গ | তে ০ র স্রো | তে ০
ইত্যাদি।

একতালা।

১ ২ ৩ ০ ১
আ ॥ মার এ ই | যা ০ ত্রা | হ ল ০ | সু রু ০ | ০ এ খন |
ইত্যাদি।

দেখা যাচ্ছে যে কাওয়ালীতে প্রত্যেকটি টুকরা চার মাত্রা এবং একতালায় তিন মাত্রায় বিভক্ত।

অতঃপর লয়। তালের মারপ্যাঁচ "লয়" জিনিসটি নিয়ে। কোনো বিশেষ মাত্রা আপেক্ষিক ভাবে বিলম্বিত বা দ্রুত হবার উপর লয় নির্ভর করে।

বলা বাহুল্য তাল জিনিসটা সম্পূর্ণরূপে সুর-নিরপেক্ষ। যেমন তালে পা ফেলা চলে, এমন কি তালে কথা বলা, কান্নাও সম্ভবে। গ্রামোফোনে সাহেবের যে উৎকট হাসিটা প্রায়ই শোনা যায়, তাও তালেই হাসা হয়েছে।

তাল যে শুধু সুর-নিরপেক্ষ, তা নয়—ধ্বনি-নিরপেক্ষও বটে। গানের বৈঠকে সমজ্‌দারদিগকে চক্ষু মুদ্রিত করে গ্রীবা সঞ্চালন দ্বারা তাল দিতে প্রায়ই দেখা যায়। হস্তচালনা দ্বারাও তাল দেওয়া চলে। এক কথায় তালের জন্য গতি আবশ্যক। তাল ও সুরের সম্বন্ধ বিচার করাই আমার উদ্দেশ্য।

(২)

রাগিণী ও সুর—এ দুটি শব্দ সঙ্গীতে ভিন্ন অর্থে ব্যবহার করা উচিত। মানুষের মুখাবয়বের সঙ্গে মুখভাবের যে সম্বন্ধ, রাগিণী এবং সুরেতেও সেই সম্পর্ক। রাগিণীকে গানের আকৃতি এবং সুরকে তার প্রকৃতি বলা যেতে পারে। রাগিণীর সাহায্যে দশজনের ভিতরে গানের মুখ চিনে নিতে পারি, আর সুরের সাহায্যে বুঝতে পারি তার বেদনা—পুলক-বেদনা, ব্যথা-বেদনা, কিম্বা অন্য কোন বেদনা।

সেইজন্য সঙ্গীত-শাস্ত্রে রাগরাগিণীর ঠাট নির্দ্ধারণ করে দেওয়া সম্ভব হয়েছে; বর্জ্জনীয় অবর্জ্জনীয় পর্দ্দাগুলি এমনি কড়াকড়ভাবে স্থির করে দেওয়া হয়েছে যে, তার সীমা লঙ্ঘন করেছ কি গান 'মার্ডার' করেছ!

রাগিণী বেচারী বড়ই ভালমানুষ। সে যেন সঙ্গীত-রাজ্যের ভূগোল। সে জায়গার শুধু একটা নাম। অবশ্য প্রত্যেক জায়গার প্রত্যেক রাগিণীর একটা বিশেষ চেহারা আছে। কোনোটি পর্ব্বতে অরণ্যে বন্ধুর, কোনোটিতে শুধু একটানা রাস্তা; আবার কোনোটিতে প্রভাত তার স্বর্ণ-অর্ঘ্য নিয়ে প্রতিদিন এসে নিঃশব্দে দাঁড়ায়, কোনোটিতে বা সূর্য্যাস্তের বিচ্ছুরিত ম্লান স্বর্ণ আভা হৃদয়ের অন্তস্তলে অব্যক্ত বেদনা রেখে ধীরে ধীরে নিভে যায়।

দেশ ও কাল—এ দুয়ের মধ্যে আমাদের সঙ্গীত-শাস্ত্রকারেরা কালের সঙ্গে রাগরাগিণীর ঘনিষ্ঠতার কথা বারবার বলে গেছেন। বিহগের কাকলির সঙ্গে রামকেলী, মধ্যাহ্নে সারঙ্গ, সূর্য্যাস্তের সঙ্গে পূরবী, স্তব্ধরাত্রে বেহাগ। কিন্তু দেশের সঙ্গে গান যে একেবারে সম্পর্কশূন্য, এরূপ ত মনে হয় না। যেমন বাগেশ্রী;—গভীর অরণ্য-সমাকীর্ণ দিগন্তবিস্তৃত বন্ধুর পর্ব্বতশ্রেণী কিম্বা উচ্ছ্বসিত উদ্বেলিত দিগন্তব্যাপী সমুদ্রের কুলই বাগেশ্রীর প্রশস্ত ক্ষেত্র। বাগেশ্রীর উদাত্ত, অনুদাত্ত অভ্রভেদী স্বরিত যেন তরঙ্গিয়া চলিয়াছে—

দুর্গম দুরূহ পথে কি জানি কি বাণীর সন্ধানে!
দুঃসাধ্য উচ্ছ্বাস তার শেষপ্রান্তে উঠি আপনার,
সহসা মুহূর্ত্তে যেন হারায়ে ফেলেছে কণ্ঠ তার।

আবার পুরবীর দেশে যখন 'নামল ছায়া ধরণীতে', তখন ঘাটের বধূ বলছে—

জলধারার কলস্বরে সন্ধ্যা-গগন আকুল করে,
ওরে ডাকে আমায় পথের পরে সেই ধ্বনিতে।

* * * *

এখন বিজন পথে করে না কেউ আসা-যাওয়া,
ওরে প্রেমনদীতে উঠেছে ঢেউ, উতল হাওয়া।
জানিনা আর ফিরব কিনা, কার সাথে আজ হবে চিনা,
ঘাটে সেই অজানা বাজায় বীণা তরণীতে।

আর সজলমেঘভারাক্রান্ত আকাশের নীচে মল্লারের পুলক সেইখানে, যেখানে—

ব্যথিয়া উঠে নীপের বন পুলকভরা ফুলে,
উছলি উঠে কলরোদন নদীর কুলে কুলে।

কিন্তু আসল কথা হচ্ছে, দেশ ও কালের অতীত নয়,—কালও দেশের বাইরে নয়। শঙ্কা হচ্ছে কথায় কথায় category-র রাজ্যে গিয়ে পড়ব। দর্শনশাস্ত্রে দেশ ও কাল—এই দুই category নিয়ে যে কিরূপ কুরুক্ষেত্র বেধে গেছে, তা দেখলে চক্ষু বিস্ফারিত হয়ে যায়। এ সম্বন্ধে গোটা গোটা কেতাব লেখা হয়ে গেছে! ইদানীং ফরাসী দার্শনিক Bergson, বর্ত্তমান, অতীত ও ভবিষ্যত-বোধের—অর্থাৎ সময়বোধের—কতকগুলি আশ্চর্য্য যুক্তিপূর্ণ কারণ দেখিয়ে সকলকে কিছু ঠাণ্ডা করেছেন। যাক্ ওসকল অবান্তর কথা। আমরা সাদা চক্ষু মেলে দেশ ও কালের দিকে তাকালে দেখতে পাই যে, দেশ ও কাল পরস্পর পরস্পরকে আশ্রয় করেই রয়েছে। দেশের অস্তিত্বই

কালের লীলা সম্ভব করছে, এবং দেশের বৈচিত্র্যও কালেই সংঘটিত হচ্ছে। অতএব নীপের বনে যে মল্লারের পুলক, সেটা বর্ষাকাল বলেই হচ্ছে,—তা না হলে পুলকভরা ফুল ফুটত না। বস্তুতঃ, দেশই বল, কালই বল,—উভয়ের অস্তিত্বই সেই লোকে, যাকে নীতিশাস্ত্রে বলা হয়েছে "Universe of thought"; কেননা এই দৃশ্যমান জগতের উপর যে সঙ্গীত নির্ভর করে না, তা অন্ধের সঙ্গীতপটুতা হতেই বুঝা যায়। তার মানসলোকেও ভোরের তারা ফোটে, প্রভাতের অরুণোদয় হয়, সূর্য্যাস্তের ঘনঘটা সংঘটিত হয়।

অতএব চিত্তটা যদি অন্তরবির ছটার মোহে যথার্থই আচ্ছন্ন হয়ে থাকে, তবে ভোরে উঠে পূরবীর করুণ তান ধরলে দায়রা-সোপর্দ্দ করবার আবশ্যকতা নেই; কিম্বা উদীয়মান সূর্য্যের লোহিতরঙে যদি হৃদয়টা সত্যই রাঙা থাকে, তাহলে সন্ধ্যাবেলা ললিত ধরলে সৃষ্টি উল্টে যাবে না। কিন্তু ললিত ধরতে গিয়ে যদি অস্তাচলগামী সূর্য্যকে লক্ষ্য করে গাওয়া যায়—"অয়ি সুখময়ী উষে! কে তোমারে নিরমিল, বালার্ক সিন্দুর-ফোঁটা কে তোমার ভালে দিল,"—তবে অবশ্যই সৃষ্টিকে উল্টে ফেলা হবে।

(৩)

বস্তুর সঙ্গে আকাশের যে সম্বন্ধ, কথার সঙ্গে তার ব্যঞ্জনারও সেই সম্বন্ধ। বৃক্ষের চতুষ্পার্শ্বের আকাশ এবং পত্র ও শাখার মধ্যে বিক্ষিপ্ত খণ্ড-আকাশই বৃক্ষকে গঠন প্রদান করে;—এমন কি পত্রের বর্ণ, হিল্লোল, মর্ম্মরকলতান,—সমস্তই আকাশ হতে প্রাপ্ত। তেমনি

সঙ্গীতের সার্থকতা তার ব্যঞ্জনার আকাশে। সেখানে সে পরিব্যাপ্ত হয়ে মুহূর্ত্তকে অনন্তে ছড়িয়ে দেয়; মানুষকে অতি-মানুষে, ঘরকে বাইরে এবং বিশ্বকে বিশ্বাতীতে নিয়ে চলে। কথার ফাঁকে ফাঁকে সঙ্গীত মূর্ত্ত, পুলকিত হতে থাকে। সুরের মোচড়ে সৃষ্টির মর্ম্মস্থান নিগূঢ় ব্যথায় ব্যথিত হয়ে ওঠে, এবং সে বেদনা দূরে—আরো দূরে গিয়ে মিশে যায়।

সুতরাং সুরের বৈঠকে যখন সুরাসুরের সংগ্রাম বেধে যায়, তখন সঙ্গীত খুব জমে বটে, কিন্তু এতই নিরেট হয়ে জমে যে, তার ভিতর পল্লবের স্নিগ্ধ হিল্লোলটুকুর জন্যও একটু ফাঁকার সংস্থান হয় না,—কলা একেবারে কস্‌রৎ হয়ে পড়ে।

সঙ্গীত-শাস্ত্র দূরের কথা, নাট্য-শাস্ত্রতেও যে কথার চেয়ে ইঙ্গিতের আবশ্যকতা ঢের বেশী—এটা ক্রমশঃ বর্ত্তমান যুগে স্বীকৃত হচ্ছে। সাহিত্যেও violence দিন দিন কমে আসছে। আত্মহত্যা, গুমখুন, এক লম্ফে প্রাকার ও পরিখা লঙ্ঘন প্রভৃতি উৎকট ব্যাপার সাহিত্য-ক্ষেত্র হতে একপ্রকার নির্ব্বাসিত হয়েছে। রঙ্গমঞ্চে লম্ফঝম্ফ দিয়ে বীরত্বের সে আস্ফালন আর নেই; ধূলায় বিলুণ্ঠিত হয়ে আর্ত্তনাদের সাহায্যে দুঃখপ্রকাশের প্রথা ঘুচে গেছে; আহ্লাদ জানাতে গিয়ে মুখ-গহ্বর আকর্ণ বিস্ফারিত করবার পদ্ধতি পরিত্যক্ত হয়েছে। দেহ-সঞ্চালনের চেয়ে কথার, কথার চেয়ে চাহনির, চাহনির চেয়ে আত্মার নিগূঢ় স্পন্দনের আভাস যে অনেক বেশী, সে বোধের পরিচয় বিশেষ করে বর্ত্তমান যুগের আর্টে পাওয়া যাচ্ছে। আধুনিক চিত্রকলাতেও গড়নের চেয়ে দেহভঙ্গির ব্যাকুলতার প্রতি বেশী মনোনিবেশ করা হচ্ছে; expression-এর কাছে anatomy পরাজয় স্বীকার করতে

বাধ্য হয়েছে। স্থিতির ভিতর গতি আশ্রয়-লাভ করে স্বীয় সুষমায় সুসম্বদ্ধ হচ্ছে।—এক কথায় আর্ট ক্রমেই static হচ্ছে।

বস্তুতঃ এ ক্ষেত্রে স্থিতি মানে গতির অভাব নয়,—গতির চরিতার্থতা। বৃত্তের ভিতর অঙ্কিত অসংখ্যভুজ ক্ষেত্র যেমন বৃত্তের পরিধির সঙ্গে মিশে যায়, তেমনি স্থিতির মধ্যে গতি লয়প্রাপ্ত হয়। এটা নির্ব্বাণ নয়,—পরিণতি।

সুতরাং যখন বেহাগে গাওয়া যায়—

জাগে নাথ জ্যোৎস্না রাতে
জাগরে অন্তরে জাগো।
তাঁহারি পানে চাহ মুগ্ধপ্রাণে
নিমেষহারা আঁখিপাতে।
নীরব চন্দ্রমা, নীরব তারা,
নীরব গীতরসে হল হারা।
জাগে বসুন্ধরা, অম্বর জাগেরে,
জাগেরে সুন্দর সাথে—

তখন ক্ষুদ্র বাক্যগুলির ব্যবধান বিলম্বিত হয়ে হয়ে বিশ্বের কোলাহলের উপর এমনি নিবিড় করে পর্দ্দার পর পর্দ্দা টেনে যেতে থাকে যে, সমগ্র সৃষ্টি একটা অখণ্ড নীরবতায় তর্জ্জমা হয়ে যায়, এবং এই ঘোর নিস্তব্ধতার ভিতর বিশ্ববিধাতার জাগ্রত সত্ত্বায় যেন নিখিল জগত ওতপ্রোত হয়ে পড়ে। বাক্যের ব্যবধানের মধ্যে সঙ্গীত লীলায়িত, তরঙ্গিত, স্পন্দিত হতে থাকে।

ওস্তাদেরা প্রত্যেক রাগিণীতে এমন একটা পর্দ্দা আবিষ্কার করেছেন, যাকে তাঁরা ঐ রাগিণীর "জান" (অর্থাৎ প্রাণ) বলে থাকেন। সেইটিই

নাকি রাগিণীর ব্যক্তিত্বের কেন্দ্র; রাগিণী তার সৌন্দর্য্য ঐ পর্দ্দাটি হতেই লাভ করে। সে পর্দ্দাটি কোন রাগিণীতে মধ্যম (মা), কোনোটিতে কড়ি মধ্যম (ক্ষা) ইত্যাদি। তাঁদের এ আবিষ্কারের যে কোনই সার্থকতা নেই—এরূপ বলা যায় না। কিন্তু জীবের প্রাণকেন্দ্র হৃৎপিণ্ড—এ কথা যতখানি সত্য, তাঁদের মন্তব্য তার চেয়ে বেশী সত্য নয়। অর্থাৎ প্রাণলীলার প্রকাশ সমস্ত দেহের ভিতর দিয়ে,—সঙ্গীতের সৌন্দর্য্য তার সুরের সমগ্র ভঙ্গিমায়।

ভীমপলশ্রী ও মুলতান, গৌরী ও পূরবী, আশাবরী ও ভৈরবী—এগুলির ভিতর ঠাটের পার্থক্য নেই বল্লেই হয়, কিন্তু এদের ব্যঞ্জনার পার্থক্য এত বেশী যে, এরা বিচিত্রভাবে হৃদয়-তন্ত্রীকে আঘাত করে। এগুলি শুন্‌লে এই কথাটিই মনে হয় যে "সুর আপনারে ধরা দিতে চায় ছন্দে"—কিন্তু ধরা দেয় না। সঙ্গীত হচ্ছে লীলা, এবং লীলা কৌতুকময়ী। সাধ্য কি তাকে নির্দ্দিষ্ট সীমানার মধ্যে নির্দ্দিষ্ট নিয়মে চলতে বাধ্য করি। ব্যর্থ রাগিণী!

ইচ্ছাশক্তির দ্বারা জীব যেমন পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়, তেমনি সঙ্গীতের সাহায্যে আত্মা অতীন্দ্রিয় জগতের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয়। সঙ্গীতকে আত্মার ইচ্ছাশক্তি বলা যেতে পারে, কেননা সঙ্গীত, আত্মার নিজেকে জিইয়ে রাখবার চেষ্টা-বিশেষ; সুতরাং এর মধ্যে বরাবর একটা সুনির্দ্দিষ্ট নিয়ম থাকা সম্ভব হতে পারে না।

(৪)

লয়ের সাহায্যে তাল সুরকে ধরবার শেষ চেষ্টা করে;—ঐখানেই তাল ও সুরের মিলনক্ষেত্র। বাঁয়াতবলায় যারা হাত পাকায়, তারা

শুধু প্রাথমিক ঠেকা দিয়েই সন্তুষ্ট থাকে, কিন্তু হাত পেকে উঠলেই সুরের বৈচিত্র্যকে ছন্দে বেঁধে ফেলবার চেষ্টা করে। ভূকম্পন যতটুকু Seismometer-এ ধরা পড়ে, সুর তার চেয়ে খুব বেশী তালে ধরা পড়ে না। ভূকম্পন বিক্ষিপ্ততায় ও অস্পষ্টতায় যেমন ভীষণ, সুর ব্যাপকতায় ও অনির্দ্দিষ্টতায় তেমনি রমণীয়। সুরের অভ্যাস এই যে, সে রাগিণী-রাজ্যের সুন্দর জায়গাটা একটু দাঁড়িয়ে বেশ করে দেখে নেয়। কিন্তু তাল বেচারী সে রসে বঞ্চিত;—সে শুধু চলতেই জানে। বাস্তবজগতে ভ্রমণকালেও এরূপ বন্ধুদ্বয়ের সম্মিলন বিরল নয়। এমতাবস্থায় দুজনের সমানে পা ফেলে চলা সম্ভব নয়। কিন্তু এরূপ মিলনের একটা বড় সার্থকতা আছে,—সে হচ্ছে কেন্দ্রবিমুখ ও কেন্দ্রাভিমুখ শক্তির সংযোগ। সুর সঙ্গীতকে পরিধির দিকে ছুটিয়ে নিয়ে চলে, তাল তাকে কেন্দ্রের দিকে টেনে রাখে। কিন্তু এ অবস্থায়ও যে আমরা সগোল বৃত্ত প্রত্যাশা করতে পারিনে, তার প্রমাণ ভূমণ্ডলের গতি। সম্ভবতঃ ভূমণ্ডলের এ ছন্দঃপাত বিশ্বেশ্বর হাস্যমুখে উপভোগই করেন।

Maeterlinck-এর "Wisdom and Destiny" একখানা আশ্চর্য্য পুস্তক। মানব-জীবনের মাধুর্য্য অমন করে খুব কম লেখকই দেখাতে পেরেছেন। তিনি দেখিয়েছেন যে, যদিও আমরা বিচার-বুদ্ধিকে (Reasoning) মানুষের শ্রেষ্ঠ সম্পদ বলে থাকি, ব্যবহারিক জীবনে Wisdom-এর তুলনায়—Dogmatism-এর তুলনায় নয়—তার স্থান অনেক নীচে। দয়া, প্রেম, স্নেহ প্রভৃতি কোমল বৃত্তিগুলি যে নিয়মে নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে, তার মধ্যে যুক্তির নাম-গন্ধও থাকে না, কিন্তু (তিনি বলেন) তা বলে কি তারা অসত্য?

সুরও নিজের প্রয়োজনে নিজেকে গড়ে নেয়, এবং তার প্রয়োজন

অনন্ত ও বিচিত্র; কারণ সুর হচ্ছে হৃদয়ের প্রকাশ। হৃদয়-বৃত্তিগুলির বৈচিত্র্যের ভিতরে নির্দ্দিষ্ট নিয়ম শুধু তাঁরাই আবিষ্কার করতে পেরেছেন, যাঁরা মানুষের ব্যক্তিত্ব দুহাত দিয়ে অস্বীকার করে থাকেন। কি রাষ্ট্রীয় ইতিহাসে, কি সামাজিক ইতিহাসে, এঁরা এমন সকল নিয়ম দেখতে পান যে, সেগুলির উপর দাঁড়িয়ে এঁরা অকুতোভয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করে থাকেন। আজও Vitalists আর Mechanists-দের লড়াই প্রচণ্ডবেগেই চলছে। শুনা যায় "ঐতিহাসিক নিয়মের" একজন আবিষ্কর্ত্তা (জর্ম্মান-অধ্যাপক Niebuhr) ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের জুলাই মাসের ফরাসীবিদ্রোহের পর ভগ্ন-হৃদয়ে ইহলীলা সম্বরণ করেন,—কারণ উক্ত বিদ্রোহ তাঁর "ঐতিহাসিক নিয়মের" বাইরে পড়ে গিয়েছিল!

সুতরাং প্রয়োজনে পড়ে রাগিণী 'বেপর্দ্দ' হয়ে গেলে, ওস্তাদমহোদয়গণ Niebuhr-এর পরিণামকে স্বচ্ছন্দে বাহবা দিতে পারেন, নয় তো সঙ্গীতটিকে মিশ্ররাগিণীর কোঠায় ফেলে বীরদর্পে গোঁফে চাড়া দিতে পারেন।

মানব-ইতিহাসের অনেক ক্ষেত্রেই সৃষ্টি অপেক্ষা সৃষ্টিতত্ত্ব বড় হয়ে ওঠে। প্রাগৈতিহাসিক যুগেও মানুষের ধর্ম্ম ছিল, কিন্তু ধর্ম্ম-তত্ত্ব তখন লিখিত হয় নি। থিয়লজি বয়স হিসেবে রিলিজানের কাছে দুগ্ধপোষ্য শিশু হলেও, সে এখন তার বড়দাদা হয়েছে। চিত্রকলার চেয়ে চিত্রতত্ত্ব, কাব্যের চেয়ে কাব্যতত্ত্ব শ্রেষ্ঠ হয়ে উঠেছে। এই anachronism-এর গুরুত্ব সম্বন্ধে বেশী কিছু বলা অসম্ভব। আর্টের পক্ষে এটা যে কিরূপ প্রচণ্ড বাধা তা বুঝিয়ে বলা দুঃসাধ্য, এবং এর জবাবদিহি—কি সাহিত্যে, কি শিল্পে, কি সামাজিক সমস্যায়—বাঙালীকে যে বেশ করেই দিতে হচ্ছে, তার প্রমাণ প্রবাণ ও নবীনদলের বর্ত্তমান লড়াই।

শ্রীশিশিরকুমার সেন।

গ্রীসে ভাষার লড়াই।

—:০:—

বাংলা সাহিত্যের আসর আজকাল ভাষার তর্কে সরগরম। কি রকম ভাষায় আমাদের সাহিত্য তৈরি হওয়া উচিত, এ বিষয়ে ছোট বড় মাঝারি নানা রকম সাহিত্যিকের নানা রকম মতের সংঘর্ষে তর্কটা বেশ একটু গরম হয়ে উঠেছে। অবস্থা আমাদের যতই গুরুতর হোক না কেন, একটা আশার কথা এই যে আমাদের ঝগড়াঝাঁটি কাগজে কলমে আবদ্ধ। গ্রীকেরা কিন্তু এ বিষয়ে আমাদের ছাড়িয়ে উঠেছিল। দাঙ্গা হাঙ্গামাতেও তারা পিছ্‌পাও হয়নি। সে ত বেশী দিনের কথা নয়, পনেরো ষোলো বছর হবে। গ্রীসের সেই ভাষা-যুদ্ধের একটা ছোট খাটো বিবরণ বাঙালী পাঠকদের কাছে উপস্থিত করছি।

বর্ত্তমান গ্রীসে দুটী ভাষা প্রচলিত আছে—একটী মুখের ভাষা, আর একটী লেখার ভাষা। শেষোক্তটীকে "পণ্ডিতি" (learned) বা "সাধু" (purist) ভাষা বলা হয়। অধিকাংশ লেখকই অবশ্য সাধুপন্থী। যা-কিছু সাধারণের নয়নগোচর করা হয়—যেমন খবরের কাগজ, বিজ্ঞাপন প্রভৃতি, সমস্তই এই ভাষায় লেখা। চিঠি-পত্রে স্কুলে-কলেজে, আফিসে-পার্লিয়ামেণ্টে, এ ভাষারই চলন আছে। এমন কি দু' একজন এহেন সাধু ব্যক্তিও আছেন, যাঁরা এ ভাষায় কথাবার্ত্তাও কয়ে থাকেন। প্রথমটার নাম সাধারণ (ordinary)

বা অসাধু (vulgar) ভাষা। এ ভাষা কোথাও শেখানো হয় না কিন্তু সকল গ্রীকই এ ভাষা জানে ও অক্লেশে বলতে পারে। দু' চারটে সাধু শব্দের সহযোগে এই ভাষাই সাধারণতঃ এথেনীয় ভদ্র-সমাজে ব্যবহৃত হয়। এ দুই ভাষায় তফাৎ যথেষ্ট—কথা, উচ্চারণ, শব্দরূপ, বাক্যবিন্যাস, সকল বিষয়েই এ দুয়ের ভিতর স্পষ্ট প্রভেদ লক্ষিত হয়।

এই রকম ভাষার অনৈক্য হোমারীয় কবিতার প্রাচীনতম অংশ-গুলিতেও চোখে পড়ে। হোমারের সময় গ্রীসে কতকগুলি প্রাদেশিক ভাষা (dialects) মাত্র প্রচলিত ছিল। তাদের মধ্যে কতকগুলি সেইরূপই রয়ে গেল আর কতকগুলি সাহিত্যিক ভাষায় উন্নীত হোল। এই অপভাষাগুলিকে সাধারণতঃ দুভাগে ভাগ করা হয়—(১) আইওনিয় (২) অন-আইওনিয়। অ্যাটিক ভাষা—অর্থাৎ যে ভাষা শুধু এথেন্সে চলত ও যে ভাষায় প্লেটো ও থুকিডিডিস্ লিখতেন—তা এই আইওনিয় শ্রেণীর একটী বিশেষ বিভাগ।

মেডিক (medic) সমরের পর এথেন্সের গৌরব বেড়ে উঠ্‌ল। সঙ্গে সঙ্গে তার ভাষার পদও উপরে উঠে গেল। ফ্রান্সে যেমন Ile-de-france-এর প্রচলিত ভাষা সমস্ত দেশময় ছড়িয়ে গেল, গ্রীসেও তেমনি অ্যাটিক ভাষা সমুদয় গ্রীসদেশে প্রচলিত হোল। অন্যান্য প্রাদেশিক ভাষার সংস্পর্শে এসে কিছু কিছু পরিবর্ত্তিত হয়ে, এই ভাষাই গ্রীসের "সাধারণ ভাষা" হয়ে দাঁড়াল।

তারপর ক্রমে ক্রমে রোমীয়েরা, স্লাভেরা, ফ্রাঙ্কেরা ও তুর্কীরা গ্রীস জয় করেছে। তারা গ্রীক-ভাষার উপর নিজ নিজ ভাষার ছাপ রেখে গিয়েছে বটে কিন্তু তার নিজস্ব রূপটীকে কিছুতেই নষ্ট কর্ত্তে পারে

নি। যে ভাষা আজকালও এথেন্স ও অন্যান্য নগরে চল্‌ছে তার স্বরূপটী সেই আলেকজান্দারের সময় হতে প্রচলিত "সাধারণ ভাষা"তেই পাওয়া যায়। এই হচ্ছে বর্ত্তমান গ্রীসের মুখের ভাষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

(২)

কিন্তু মুখের ভাষা ছাড়াও গ্রীসে আর একটী লেখার ভাষা আছে।

প্রাচীনকালে এ দুটি ভাষা যেন সমান্তরালভাবে চলেছিল। হোমার থেকে প্লেটো এবং প্লেটো থেকে প্লুটার্ক পর্য্যন্ত মুখের ভাষাও যেমন বদ্‌লেছে, লেখার ভাষাও অনেকটা সেই রকম ভাবেই বদ্‌লেছে। মৌখিক ভাষার সঙ্গে লেখার ভাষার আসলে ছাড়াছাড়ি সুরু হ'ল কিন্তু বৈজান্তীয় (Byzantine) যুগে। তখন গ্রীসে কোনও জীবন্ত সাহিত্য না থাকায় লেখকেরা একমাত্র প্রাচীন যুগের সাহিত্যের চর্চ্চায় মনোনিবেশ কর্‌লেন। তাঁরা প্রাচীন সাহিত্য থেকে কেবল তাঁদের লিখবার বিষয় অনুকরণ করেই নিরস্ত হলেন না, তাঁদের লিখবার ভঙ্গীটি পর্য্যন্ত অনুকরণ কর্ত্তে লাগলেন। এই রকমে মুখের ভাষা যখন সামনের দিকে পুরোদমে এগিয়ে যেতে লাগল, লেখার ভাষা তখন প্রাচীন কথা ও শব্দ এবং প্রাচীন লিখবার ভঙ্গীর মধ্যে নিজেকে গণ্ডীবদ্ধ করে ফেল্‌তে আরম্ভ কর্‌লে।

কিন্তু এ রোগেরও ঔষধ আছে। তাই দ্বাদশ শতাব্দীতে, বা তার কাছাকাছি সময়ে সাহিত্যে একটী নূতন লিখন-ভঙ্গী দেখা গেল

যার ভিত্তি হচ্ছে মুখের ভাষা। ফ্রান্স, স্পেন ও ইটালীতে নূতন ভাষা পুরাতন ভাষাকে হটিয়ে দিয়ে তাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু গ্রীসের বেলা তা হয় নি। না-হবার কারণ এ নয় যে সে ভাষায় উঁচুদরের পুস্তকাদি রচিত হয় নি। এর একটী বিশেষ কারণ ছিল, যা অন্য কোন দেশে দেখা যায় নি। শিক্ষিত গ্রীকেরা কলমের জোরে তাদের মৃত ভাষাটীকে আবার লেখায় সজীব ক'রে তোলবার চেষ্টা করেছিল। এই ভাষার মধ্যে তারা যেন প্রাচীনকালের সহিত তাদের একটী সুদৃঢ় বন্ধন দেখতে পেত ; এ ভাষা যেন নিশ্চয় ক'রে তাদের জানিয়ে দিত যে তারা সত্য সত্যই সেই পেরিক্লিসের বংশধর। গ্রীসের সেই গৌরবময় অতীতকাল যে তাদেরই অতীতকাল এ সান্ত্বনা তারা এই ভাষা ভিন্ন আর কোথাও পেত না। পতিত জাতির অতীতভক্তির আতিশয্যবশতঃই গ্রীসের মৌখিক ভাষা ফ্রান্স স্পেন ইটালি প্রভৃতির মৌখিক ভাষার মতো সাহিত্যে স্থান পেলে না।

(৩)

কিন্তু অবস্থা সঙ্গীন হয়ে উঠলো—ঊনবিংশ শতাব্দীতে। গ্রীস স্বাধীনতা লাভ কর্‌বার ঠিক আগেই গ্রীকদের মধ্যে একটী জাতীয়তার ভাবের পুনরাবির্ভাব হয়েছিল। সেই সময়ে এই প্রশ্ন উঠ্‌লো, যে সমস্ত জাতির পক্ষে ভাবপ্রকাশের জন্যে কোন্ ভাষা অবলম্বন করা কর্ত্তব্য। দুই বিভিন্ন দলের মুখপাত্র হয়ে অনেক লোকে অনেক লেখা লিখ্‌লেন। সে সব লেখা যে মাঝে মাঝে ভদ্রতার সীমা অতিক্রম করে নি তাও

বলা যায় না। ভিয়েনা, আমষ্টারডাম্, বুখারেষ্ট প্রভৃতি স্থান থেকে শিক্ষিত গ্রীকেরা পুস্তিকা রচনা ক'রে ছাপাতে লাগলেন। চারিদিকে একটা হৈ-চৈ পড়ে গেল। তারপর ১৮২১ সালে গ্রীসে স্বাধীনতার সমর জ্বলে উঠ্‌লো। সাত বছর ধরে সে যুদ্ধ চলে। সে সাত বছর অবশ্য এই ভাষার ঝগড়া বন্ধ ছিল। তারপর Coray নামে একজন গ্রীক-পণ্ডিত সাহিত্যে একটি "মধ্যপথের" ব্যবস্থা কর্‌লেন; কিন্তু সে পথ কেউ অবলম্বন কর্‌লে না।

Roidis তাঁর "পুত্তলিকা" নামক গ্রন্থে এই মত প্রকাশ কর্‌লেন যে লেখার ভাষা থেকে তার প্রাচীন রূপগুলি একে একে পরিত্যাগ কর্‌লেই কালক্রমে লেখার ভাষা ও মুখের ভাষা এত কাছাকাছি এসে দাঁড়াবে যে তাদের মধ্যে বিশেষ কোন অনৈক্য থাক্‌বে না। তাঁর কথা যে কতটা সত্য তা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগের গদ্যের সহিত প্রথম ভাগের গদ্যের তুলনা কর্‌লেই বুঝতে পারা যায়।

কিন্তু সমরধর্ম্মে তখন "স্যাক্‌রার ঠুক্‌ঠাক্" এর চেয়ে "কামারের এক ঘা" এর বেশী দরকার হয়েছিল। তখন বুঝিয়ে দেওয়ার দরকার হয়েছিল যে প্রাচীন গ্রীকই সাধু আর আধুনিক কথিত গ্রীক যে অসাধু, এ বিশ্বাসটা একটা মস্ত ভুল। এ কথা তখন কেউই মান্‌ত না যে এমন কোন ভাষা থাক্‌তে পারে না, যা স্বভাবতঃই দুর্ব্বল বা দরিদ্র, এবং শিল্পীর হাতে সব ভাষাই সমান খেলে। ফ্রান্সে ভিক্তর হ্যুগো যা করেছিলেন, গ্রীসে Psichari-ও তাই কল্লেন। ১৮৮৮ খৃঃ অব্দে তাঁর "আমার ভ্রমণ" গ্রন্থ সেই "কামারের ঘা" দিলে।

১৮৮৬ সালে Psichari, কনষ্টাণ্টিনোপল, কিওস ও এথেন্স বেড়াতে গিয়েছিলেন। এই ভ্রমণ-কাহিনীটিকে ভিত্তি করে তিনি

রঙ্গ-ব্যঙ্গ কারুণ্যপূর্ণ কবিত্বময় একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। এতে গ্রীক্-জীবন ও জাতীয় অন্তরাত্মার সুন্দর প্রতিকৃতি ছিল; জাতীয় দোষগুলির বিশেষতঃ ভাষাবিষয়ে পাণ্ডিত্যাভিমানের উপর তীব্র শ্লেষ ছিল; আর সেই সঙ্গে ভাষার উন্নতি ও বিবর্ত্তন সম্বন্ধে বিজ্ঞানের নূতন নূতন তথ্যগুলি অতি নিপুণভাবে সন্নিবিষ্ট ও বিবৃত হয়েছিল। বইখানি মুখের ভাষায় লেখা—কিন্তু লেখার ভঙ্গীটী যেমন সুন্দর তেমনি মোলায়েম, তার কোনখানে খিচ নেই খুঁত নেই। বানানেরও কতকগুলি নূতন রীতি তিনি এই গ্রন্থে প্রচলিত করেন। এই রীতিগুলি তাঁর বহু বৎসরের ভাষাবিজ্ঞানচর্চ্চা ও বিস্তর গবেষণার ফল।

বইখানি প্রকাশিত হওয়ার পরই গ্রীসে বেশ একটু উত্তেজনার সাড়া পাওয়া গেল। দুঃখের বিষয় অতি অল্প লোকই এ গ্রন্থের পুরো মর্য্যাদা বুঝতে পেরেছিলেন। অনেকে আবার এর অন্য সমস্ত গুণ স্বীকার করে ভাষাসম্বন্ধে ভয়ানক আপত্তি জানাতে লাগলেন। সমালোচকগণ দু' চারখানা পাতা পড়েই তাঁদের বাঁধাবুলিতে গালাগালি দিতে আরম্ভ কল্লেন। কাগজগুলির মধ্যে কেবল একখানি এর স্বপক্ষে ছিল এবং কেবল একজন লেখক, Roidis, এর উপর একটী অতি চমৎকার প্রবন্ধ লিখলেন। প্রবন্ধটী সাধুভাষায় লেখা, কিন্তু মৌখিক ভাষার পক্ষে এটী সকলের চেয়ে যুক্তিযুক্ত ওকালতী বলে গ্রীক্-সাহিত্যে স্থান পেয়েছে। তাতে তিনি দেখিয়ে দিলেন যে Psichari-র মতগুলি সত্য ও অভ্রান্ত। অনেকেই এই প্রবন্ধ পড়ে তাঁর মত অবলম্বন করেছিলেন।

(৪)

এইবার আমরা ভাষাবিপ্লব সংশ্লিষ্ট গ্রীসের সেই অদ্ভুত দাঙ্গাটীর কথা উল্লেখ কর্‌র। Acropolis পত্রে Mr. Pallais, St. Malthew-র Gospel-এর অনুবাদ প্রকাশ কর্ত্তে আরম্ভ করেন। অনুবাদটী "অসাধু" ভাষায়। জনসাধারণ বিশেষতঃ ছাত্রের দল এতে বড়ই উত্তেজিত হয়ে উঠ্‌লো। স্কুলে তারা চিরকাল সাধু ভাষাতে বই পড়ায় অভ্যস্ত; মুখের কথা ছাপার অক্ষরে দেখে তাদের চোখ যেন জ্বলে গেল। এ ভাষায় ধর্ম্ম-পুস্তকের অনুবাদ তাদের কাছে ধর্ম্মের-ই অবমাননা বলে মনে হতে লাগলো। তারা সরকারের কাছে এই বলে আবেদন করে পাঠালে যে সমস্ত বাইবেল-অনুবাদকগুলিকে সমাজচ্যুত করা হোক্। সে আবেদন গ্রাহ্য হোল না। তারপর একদিন তারা Olympian Jupiter-এর স্তম্ভের চারিদিকে জড় হোল; ক্রোধ ও মদ তখন তাদের পেয়ে বসেছে। একজন ছাত্র উঠে এই বক্তৃতা দিলে যে শুধু অনুবাদকদেরই সমাজচ্যুত কর্‌লে যথেষ্ট হবে না। যারা ঐ রকম অনুবাদ পড়ে তাদেরও শাস্তি দেওয়া দরকার। আর যেখানে যেখানে ঐ অনুবাদ পাওয়া যাবে তা পুড়িয়ে ফেল্‌তে হবে। প্রধান মন্ত্রী তখন খোলা গাড়ীতে বেড়াতে যাচ্ছিলেন; অমনি তারা সেই গাড়ীর উপর গুলি বর্ষণ করতে লাগল। তিনি তাঁর বাড়ীতে ফিরে এলে সেই বাড়ীও তারা আক্রমণ করেছিল। সৈনিকেরা ভিড় ভেঙ্গে দিতে এলে তারা দু'চার জনকে মেরে ফেলতেও কুণ্ঠিত হয় নি। সে দিন সৈনিকেরা অতুলনীয় ধৈর্য্য দেখিয়েছিল। প্রাণ যায় তাও স্বীকার, তবু তারা স্বদেশবাসীর উপর গুলি চালায় নি, শুধু ফাঁকা আওয়াজ করেই ক্ষান্ত হয়েছিল। এতেও কিন্তু সাধুভক্তদের উত্তেজনা কম্‌লো

না। এথেনীয় সংবাদ পত্রগুলি আবার সাধারণের এই রোষাগ্নিতে ঘৃতাহুতি দিতে লাগ্‌লো। সমস্ত ইয়োরোপ স্তম্ভিত হয়ে গ্রীসের এই অস্বাভাবিক চিত্তবিকার লক্ষ্য করতে লাগল।

ব্যাপারটা ইয়োরোপকে বোঝান শক্ত। এ কথা ইয়োরোপ জানে যে ভাষান্দোলনে কাগজের উপর কালির বান-ই ডাকে; তা নিয়ে যে তাজা মানুষের রক্তের রক্তগঙ্গা বইতে পারে এ তার স্বপ্নাতীত। ইয়োরোপের বিস্ময় দেখে গ্রীক্ পণ্ডিতসমাজ অত্যন্ত লজ্জিত হয়ে উঠলেন। ইয়োরোপকে বোঝাবার জন্যে তাঁরা একটা চলনসই কৈফিয়তের অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হলেন। কেউবা বল্লেন ধর্ম্মই এ হাঙ্গামার কারণ, কেউবা বল্লেন, রাজনীতি। কিন্তু Psichari ফ্রান্সের La Revue পত্রে একটি প্রবন্ধে স্পষ্ট করে প্রতিপন্ন করে দিলেন যে এই ব্যাপারের কারণ হচ্ছে একটী মাত্র—সেটী এই যে বর্ত্তমান অনুবাদটীর ভাষা "অসাধু"। গ্রীকচার্চ্চ বাইবেলের অনুবাদের বিপক্ষে নহেন; এতদিন বরং তাঁরা অনুবাদ-প্রচারকে বিশেষ ভাবে উৎসাহিত করেই এসেছেন। এই অনুবাদটীর উপর তাঁরা এত বিরক্ত কেন? শুধু মুখের ভাষায় লেখা বলে। Psichari-র কথায় ইয়োরোপ বুঝল ব্যাপারখানা কি।

(৫)

এখন জিজ্ঞাস্য এই যে মুখের ভাষার উপর এত রাগ কেন? এ নিয়ে গ্রীসে অনেক তর্ক-বিতর্ক হয়ে গেছে। আমরা এখন তার সারমর্ম্ম দেব।

গ্রীসের সাধুপন্থীরা বলেন—"অসাধু" ভাষা সাবেক্ গ্রীক্ ভাষার বিকৃত আকার।

প্রতিবাদীরা বলেন—যে ভাষা সমস্ত গ্রীক্ জনসাধারণ ব্যবহার করে, এমন কি শিক্ষিতেরাও লেখায় না হোক্, কথায় ব্যবহার করেন, সে ভাষা অসাধু হতে পারে না। তা ছাড়া এ ভাষা প্রাচীন গ্রীক্ ভাষার বিকার নয়—বিকাশ। যুগে যুগে ভাষার পরিবর্ত্তন হতেই হবে। ভাষা মানুষের চেষ্টার ফল। মানুষের যে সকল মনোবৃত্তির ক্রিয়ার ফলে ভাষা তার স্বরূপ প্রাপ্ত হয় সেগুলিও যখন পরিবর্ত্তন ও বিবর্ত্তনের অধীন তখন ভাষা যে চিরদিন এক থাকতে পারে না তাতে আর আশ্চর্য্য হবার কি আছে? আর, যদি পূর্ব্ববর্ত্তী যুগের ভাষার তুলনায় পরবর্ত্তী যুগের ভাষা বিকৃত হয়, তা হলে প্লেটোর ভাষাও হোমারের তুলনায় বিকৃত, নিউ টেষ্টামেণ্টের ভাষাও প্লেটোর তুলনায় বিকৃত।

সাধুভাষীরা বলেন—অনেক দিন অধীনতা স্বীকার করায় মৌখিক গ্রীক্ ভাষার মধ্যে বহু বিদেশী কথা এসে পড়েছে এবং তাতে করে গ্রীক্ ভাষা বিকৃত হয়েছে ও তার পবিত্রতা নষ্ট হয়েছে।

প্রতিবাদীরা উত্তর দেন—এ যুক্তির কোন মূল্যই থাকে না যখন আমরা দেখতে পাই, কোন দেশের কোন ভাষাই বিদেশের প্রভাবমুক্ত নয়। যে সব বিদেশী কথা ভাষার সঙ্গে মিশে গিয়েছে, কোন দেশের কোন লোকই সে সব কথা পরিত্যাগের পক্ষপাতী নয়। তা ছাড়া ভাষা-বিজ্ঞানের দিক দিয়েও এই সমস্ত আমদানী-করা কথার একটা বিশেষ দাম আছে। এই রকম এক একটী কথার ভিতর দেশের ইতিহাসের এক একটী যুগ প্রচ্ছন্নভাবে পুঞ্জীভূত হয়ে থাকে। ইতিহাসের এই সাক্ষীগুলিকে বিনষ্ট করবার অধিকার কারো নাই, কারো থাকতে পারে না।

আর একটা আপত্তি সাধুপন্থীরা বার বার করে তুলে থাকেন—সাধারণ গ্রীক্ ভাষা বলে বাস্তবিক কোন ভাষা নেই। গ্রীসে মুখের ভাষা সব জায়গায় এক রকম নয়। দুটী বিভিন্ন গ্রামে কথা ও তার উচ্চারণ ভঙ্গী দুই-ই আলাদা। যদি প্রত্যেক গ্রামই নিজের নিজের ভাষায় লেখে তাহলে কেমন করে একটা সর্ব্বজনীন গ্রীক্ ভাষা তৈরি হওয়া সম্ভব?

প্রতিবাদীরা কথাটীর উত্তর দেন দু' রকমে। তাঁরা প্রথমতঃ বলেন—ধরে নেওয়া যাক্ দেশের অবস্থা এই রকম। তাহলে সাধু-ভাষাই বা কেমন করে এ স্বেচ্ছাচারিতা বন্ধ করবে। ব্যাকরণের উপর গড়ে তোলা একটা কেতাবিভাষা দেশের সমস্ত কথ্য ভাষাকে উপেক্ষা করে কি রকমে স্থায়ী হতে পারে তা আমরা বুঝতে পারি নে।

দ্বিতীয়তঃ তাঁরা বলেন—দেশের ভাষার সম্বন্ধে এ কথা আমরা মানিনে। প্লেটোর ভাষা অনেক সাধুপন্থীর আদর্শ এবং সকল গ্রীক্ই প্লেটোর ভাষা বুঝতে পারেন এ গর্ব্ব অনুভব করে থাকেন। কিন্তু সাধুভাষার পক্ষপাতীর দল এ কথা কি জানেন না যে, প্লেটো এমন একটী কথাও ব্যবহার করেন নি যা তাঁর সময়ের এথেন্সে মুখে মুখে প্রচলিত ছিল না। আমরা এ কথা খুব বিশ্বাস করি যে একজন এথেনীয় যদি তাঁর শিক্ষিত ঢঙটী ত্যাগ করে সাধারণ ভাবে কথা বলেন তবে গ্রীসের সকল ভাগের লোকই তাঁর কথা বুঝতে পারে। যদিই বা কোন প্রদেশের লোক তাঁর কথা বুঝতে না পারে তাতে ক'রে এমন কিছুই প্রমাণ হয় না যে গ্রীসে কোনও সাধারণ ভাষা নাই; শুধু এইটুকু প্রমাণ হয় যে সর্ব্বত্র এখনও সে ভাষা পুরো চালানো হয় নি। ফ্রান্সে একটা সাধারণ ভাষা নেই এ কথা বোধ হয় কেউই বলবেন না

অথচ এই ফ্রান্সেই ধর্ম্ম প্রচার কর্ত্তে গিয়ে জনসাধারণকে বোঝাতে গেলে অনেক জায়গার স্থানীয় অপভাষা ব্যবহার কর্ত্তে হয়।

সাধু ভাষার দলের আর একটি আপত্তি এই যে অসাধু ভাষায় উচ্চ ভাব প্রকাশ করা যায় না। প্রতিবাদীরা উত্তরে বলেন, এ কথা যে কতদূর ভিত্তিহীন তা শুধু বর্ত্তমান গ্রীক্ সাহিত্যের দিকে চাইলেই বুঝতে পারা যায়। কবিতা ত এ ভাষাকে একেবারে একচেটে করে নিয়েছে। আধুনিক গ্রীসের দু'জন খুব উঁচু দরের কবি Solomos ও Valaority মুখের ভাষাতেই পদ্য রচনা করেছেন। গদ্যেও যে এ ভাষা কতদূর উপযোগী তা Psichari তাঁর "আমার ভ্রমণ" ও অন্যান্য গ্রন্থে দেখিয়ে দিয়েছেন। এ ভাষায় জ্যোতিষ, ইতিহাস অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়ে বই লেখা হচ্ছে। সুতরাং কেমন করে বলা যেতে পারে যে এ ভাষার সম্পদ্ কম আর এ ভাষা দিয়ে ভাব প্রকাশ করা যায় না।

একটা কথা প্রতিবাদীরা সকলকে মনে রাখতে বলেন। সাধারণ ভাষায় লিখ্‌তে হবে বলে সাধুভাষার কোন কথাই যে তাঁরা ব্যবহার কর্ত্তে পাবেন না এ কথা যেন কেউই মনে আদৌ স্থান দেন না। শিক্ষিত লোকের ও অশিক্ষিত লোকের ভাষার মধ্যে ব্যবধান সব দেশেই থাকে এবং গ্রীসেও আছে। যদি কোন কথা সাধারণ ভাষায় না থাকে তবে লেখক অনায়াসে তা সাধুভাষা থেকে নিতে পারেন। কেবল কথাটীকে এমনি ভাবে নিতে হবে যে তা যেন আন্যান্য সাধারণ কথার সঙ্গে বে-মালুম ভাবে মিশে যায়, যেন তা তাদের সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে চলে যেতে পারে।

গ্রীসে এই ভাষা-সমস্যার আজও কোন সমাধান হয় নি। দুটী ভাষাই চল্‌ছে; এখনও কোন ভাষাই একাধিপত্য স্থাপন কর্ত্তে পারে

নি। আমাদের দেশেও আজকাল ভাষান্দোলন প্রবল বেগে চল্‌ছে। গ্রীসের উদাহরণ আমাদের সত্যের আলোকের আভাস দেখিয়ে দিতে পারে এই ভরসায় এই প্রবন্ধের অবতারণা।

শ্রীনীরেন্দ্র নাথ রায় চৌধুরী।

পত্র।

(নববাণী হইতে উদ্ধৃত)

শ্রীমান্ অনুপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

কল্যাণীয়েষু

তোমরা যখন "নববাণী" প্রচার করতে কৃত-সংকল্প হয়েছ, তখন আমাদের মেনে নিতেই হবে যে, সে বাণী কোনও পূর্ব্ববাণীর প্রতিধ্বনি হবে না, নচেৎ ও নামের কোনও সার্থকতা থাকে না, এবং ও নাম সার্থক করবার আজ প্রয়োজন আছে; কেননা দিন এসেছে। আমরা যে একটা নবযুগের সন্ধিস্থলে এসে পৌঁচেছি, তার পরিচয় ত ভারতবর্ষের সকলের কথায় এবং সকল কথায় পাওয়া যায়। আজকের দিনে আমাদের আশার ও ভাষার একমাত্র বিষয় হচ্ছে—স্বরাজ্য। এ বিষয়ে আমাদের আশা যে কি তা আমাদের ভাষা থেকে ঠিক ধরা না গেলেও, এটুকু বেশ বোঝা যায় যে, আজকের দিনে সমগ্র ভারতবাসীর মনের কথা এই যে—তে হি নো দিবসা গতাঃ। আগামী কল্য কি মূর্ত্তি ধারণ করে আসবে, তা ঠিক না জানলেও, আমরা এটা ঠিক জানি যে গত কল্যের হাত থেকে আমরা মুক্তি লাভ করেছি,—অন্ততঃ মনে।

(২)

বাংলা দেশে যে-সাহিত্য ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জন্ম লাভ করে, এবং গত একশ' বৎসর ধরে বাঙ্গালী যে সাহিত্যের পুষ্টি-সাধন করে আসছে—সে সাহিত্য হচ্ছে সেই দিনের সাহিত্য,—যে দিন, আমাদের মতে গত হয়েছে। সুতরাং এই আসন্ন নবযুগে নিশ্চয়ই একটি নব-সাহিত্যের সৃষ্টি হবে, যদি বাঙ্গালী স্বরাজ্যের মোহে মনো-রাজ্যের দিকে পিঠ না ফেরায়। সে বিপদের সম্ভাবনা যে একেবারেই নেই তা নয়। আমাদের আগামী যুগ শুধু স্বরাজের নয়, "স্বদেশীর"ও যুগ হবে অর্থাৎ ভারতের লুপ্ত শিল্প বাণিজ্য এ যুগে পুনর্জ্জন্ম অথবা নব জন্ম লাভ করবে। সুতরাং বাঙ্গালীর মন অবস্থার গুণে কল-কারখানার দিকে সহজেই এতটা ঝুঁকবে যে, হয় ত সরস্বতীর বদলে বিশ্বকর্ম্মা হয়ে উঠবেন—এ দেশের একমাত্র উপাস্য দেবতা। বিশকরম পুজোর আমি বিরোধী নই ;—তাই বলে এ কথাটাও আমি ভুলতে পারি নে যে, দোয়াত-কলম ছেড়ে শুধু যন্ত্রপূজা করে কোনও জাতি, উন্নতি পড়ে থাক্ অভ্যুদয় পর্য্যন্ত লাভ করতে পারে না। তবে আশার কথা এই যে, পৃথিবীর এই আগতপ্রায় যুগ, আর যাই হোক খুব সম্ভব যন্ত্রযুগ হবে না। মানুষ যন্ত্রবৎ চালিত এবং যন্ত্রচালিত হলে অবশেষে তার যে কি দুর্গতি হয়, তার প্রমাণ ত আজকের দিনে সকলের চোখের সুমুখে পড়ে রয়েছে। ইয়োরোপের নরমেধ-যজ্ঞ হতে, যে দেবতা বিশ্ব-মানবের উদ্ধারকল্পে দক্ষিণ হস্তে বর আর বামহস্তে অভয় নিয়ে আবির্ভূত হবেন, তাঁর প্রসাদ লাভ করবে শুধু তারা যারা জানে যে, মানুষের আত্মার শক্তিই হচ্ছে তার যথার্থ আত্মশক্তি। ভবিষ্যতে কোন জাতিই আর মনে কৃপণ হয়ে জীবনে

ধনী হতে পারবে না। সুতরাং এ অবস্থায় সরস্বতীর আসন টলা দূরে থাক্, ঊনবিংশ শতাব্দীর যত পাপ এই যুদ্ধের আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে যাবার পর, মানব-সভ্যতার যে খাঁটি সোণা উদ্‌বর্ত্ত থাকবে সেই সোণায় সরস্বতীর নব পদ্মাসন নয় নব সিংহাসন রচিত হবে। অন্ততঃ এই ত আমাদের আশা।

(৩)

আমার বিশ্বাস, আমাদের গত একশ' বৎসরের সাহিত্যের পরমায়ু শেষ হয়ে এসেছে। সুতরাং সে সাহিত্যের মতি-গতির প্রতি একবার দৃষ্টিপাত করা যাক্।

প্রথমেই নজরে পড়ে যে সে-সাহিত্য নিরানন্দ। আজ একশ' বৎসর ধরে আমরা আমাদের সকল লেখায় সকল কথায় প্রকাশ করে এসেছি—শুধু অসন্তোষ। এর কারণ—আমরা আমাদের রাজনৈতিক অবস্থা, আমাদের সামাজিক ব্যবস্থা, আমাদের সাংসারিক দৈন্য, আমাদের চরিত্রের দুর্ব্বলতা প্রভৃতি কোন জিনিসই সন্তুষ্টচিত্তে গ্রাহ্য করে নিতে পারি নি। শুধু তাই নয়, আমাদের জাতীয় জীবনের এই সর্ব্বাঙ্গীন হীনতা আমাদের বুকের ভিতর অষ্টপ্রহর কাঁটার মত বিঁধছে। তার ফলে আমাদের সাহিত্য হয়েছে শুধু আক্ষেপ ও আক্রোশের সাহিত্য। এ সাহিত্যে, আমরা এক চোখ লাল করেছি,—হয় কেঁদে, নয় রেগে; আর এক চোখ আলো করেছি, বিদ্রূপের হাসিতে—সেও হয় ক্ষোভে নয় ক্রোধে। এ সাহিত্যে অবশ্য বৈরাগ্যেরও অনেক কথা আছে, কিন্তু সে সব হয় মিছে, নয় বাজে।

যার দেহে রজোগুণ নেই, তার মনে সত্ত্বগুণ থাকতেই পারে না। যে আঙ্গুরের নাগাল পাওয়া যায় না, সে আঙ্গুরকে খাট্টা বলায়—কি আধ্যাত্মদর্শন কি ভৈষজ্যবিজ্ঞান কোনটিরই পরিচয় দেওয়া হয় না। কথামালার শৃগালকে আমরা ছাড়া আর কেউ ত্যাগী পুরুষ বলে মান্য করেনি।

এই বিলাপ ও প্রলাপের জমির উপর অবশ্য গুটিকয়েক এমন ফুল ফুটে উঠেছে যার বর্ণে সাহিত্য-গগন উজ্জ্বল আর যার গন্ধে সাহিত্য-জগৎ আমোদিত হয়ে উঠেছে। এর কারণ সাহিত্য-জগতের যাঁরা মহাপুরুষ, তাঁদের প্রতিভা যুগধর্ম্মের একান্ত অধীন নয়। তাই বলে কবি-প্রতিভা কিছু আর স্বকালের সম্পূর্ণ বহির্ভূতও নয়। উদাহরণস্বরূপ রবীন্দ্রনাথের কবিতা নেওয়া যাক্; এ কবির কাব্যের পর পর চারিটি বেশ স্পষ্ট পৃথক্ যুগ আছে। মোটামুটি হিসেবে, এ কবির প্রথম যুগের সুর আনন্দের, দ্বিতীয় যুগের বেদনার, তৃতীয় যুগের বিদ্রোহের এবং চতুর্থ যুগের মুক্তির। কিন্তু তাঁর প্রথম যুগের আনন্দও নিরাবিল নয়, তার অন্তরেও হয় বেদনা, নয় বিদ্রোহের সুর ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে রয়েছে। এতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই—জাতীয় জীবনের নির্জ্জীবতার প্রতি আর যিনিই হোন কবি কখনই উদাসীন হতে পারেন না; কেননা মহাপ্রাণতাই হচ্ছে কাব্যের প্রাণ।

(৪)

তার পর নজরে পড়ে যে এ সাহিত্য আর্টিষ্টিক নয়।

এর কারণ এ সাহিত্য মুখ্যতঃ এবং স্পষ্টতঃ উদ্দেশ্যমূলক এবং সে উদ্দেশ্য হচ্ছে জাতীয় জীবনের উন্নতি সাধন। গত একশত বৎসর

ধরে বাঙ্গালী জাতি সাহিত্যে একমাত্র অসন্তোষ প্রকাশ করেই সন্তুষ্ট থাকে নি। রাজা রামমোহন রায় থেকে সুরু করে রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত বঙ্গ-সাহিত্যের মহাজনেরা সকলেই স্বজাতিকে মনে ও চরিত্রে শক্তিশালী কর্‌তে, রাষ্ট্রে ও সমাজে স্বপ্রতিষ্ঠ কর্‌তে, ধর্ম্মে ও কর্ম্মে সমৃদ্ধিশালী কর্‌তে, কায়মনোবাক্যে চেষ্টা করেছেন। যাঁরা আমাদের জাতীয় সাহিত্য রচনা করেছেন, তাঁরাই যে আমাদের জাতীয় জীবন গঠন করেছেন, এ কথা বল্‌লে নেহাৎ বাজে কথা বলা হবে না। রাজা রামমোহন রায় এবং পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের, এ বিষয়ে প্রচেষ্টা ত সর্ব্বলোকবিদিত। তার পর বঙ্কিমচন্দ্র নিজ জবানিই কবুল করেছেন যে স্বজাতির উন্নতিকল্পেই তিনি লেখনী ধারণ করেন; অর্থাৎ লেখা জিনিসটে এঁদের সকলের কাছেই ছিল জাতি-গঠনের একটি প্রকৃষ্ট উপায়মাত্র। সাহিত্যকে এঁরা একটা means হিসেবেই দেখতেন, end হিসেবে নয়। বঙ্কিমচন্দ্রের লেখার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল পরোপকার, গৌণ উদ্দেশ্য কাব্যসৃষ্টি। ফল যদি তার উল্টো হয়ে থাকে, অর্থাৎ তাঁর হাত থেকে যা বেরিয়েছে তা যদি মুখ্যতঃ সাহিত্য হয়ে থাকে ত, তার কারণ অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় মানুষের অবাধ্য প্রতিভা তার সঙ্কীর্ণ সংবল্পকে অতিক্রম করে। বঙ্কিমের লেখারও তিনটে যুগ আছে। তাঁর মধ্য-যুগের রচনাই যথার্থ কাব্য, আর তাঁর আদি ও অন্ত যুগের লেখা জাতীয় হিত-সাধনের সাহিত্য। দুর্গেশনন্দিনী ও মৃণালিনীর যুগে আর্ট তাঁর করায়ত্ত হয় নি, আর আনন্দমঠ, দেবীচৌধুরাণীর যুগে আর্ট তাঁর করচ্যুত হয়েছিল। সুতরাং এ সকল গ্রন্থের যা কিছু মূল্য সে হচ্ছে জাতীয় শিক্ষাপুস্তক হিসেবে। যদি কেউ জিজ্ঞাসা করেন, দুর্গেশনন্দিনী প্রভৃতি কি শিক্ষা দেয়? তার উত্তর

পেট্রিয়টিজম। আনন্দমঠ প্রভৃতির শিক্ষাও ঐ। দুয়ের ভিতর প্রভেদ এই যে, এর প্রথমগুলি ইংরাজি সাহিত্যের প্রভাবে রচিত আর শেষগুলি সংস্কৃতের।—এ স্থলে বলা আবশ্যক যে, সাহিত্যের—পেট্রিয়টিজম এবং রাজনীতির পেট্রিয়টিজম এক বস্তু নয়; কেননা, সাহিত্যের উদ্দেশ্য মানুষের ভিতরের অবস্থা এবং রাজনীতির উদ্দেশ্য তার বাইরের ব্যবস্থা বদল করা।

আমি পূর্ব্বে বলেছি যে, জাতীয় জীবনের প্রত্যক্ষ দৈন্যের প্রতি অন্ধ হয়ে কাব্য রচনা করা মহাপ্রাণ ব্যক্তিদের পক্ষে অসম্ভব; কিন্তু এ কথাও সত্য যে সম্পূর্ণ আত্মগত না হতে পার্‌লেও আর্টিষ্টিক সাহিত্য রচনা করা যায় না। বিষয়বিশেষে অহৈতুকী প্রীতিই হচ্ছে আর্টের বীজ এবং সে বিষয়ে তন্ময় হতে না পার্‌লে সে বীজকে বৃক্ষে পরিণত কর্‌তে পারা যায় না। রবীন্দ্রনাথ কবিতায় আত্মপ্রকাশ করেন এবং সেই জন্যেই, অর্থাৎ তিনি আত্মগত ও আত্মায় তন্ময় হতে পারেন বলেই তাঁর কবিতায় চরম আর্টের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। পদ্য হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের গড়বার যন্ত্র আর গদ্য তাঁর ভাঙ্গবার অস্ত্র। তাঁর কবিতার ধর্ম্ম হচ্ছে সত্য শিবসুন্দরের প্রতিষ্ঠা করা আর তাঁর বিচারপ্রসঙ্গের ধর্ম্ম হচ্ছে অসত্য অশিব ও অসুন্দরের উচ্ছেদ করা। সুতরাং তাঁর প্রায় সকল গদ্য লেখাই উদ্দেশ্যমূলক, এবং তাঁর ছোট-বড় অনেক গল্পও একেবারে উদ্দেশ্যমুক্ত নয়। ম্যাথু আরনল্‌ড যাকে Criticism of life বলেন,—রবীন্দ্রনাথের গল্প সাহিত্যে তা যথেষ্ট পরিমাণে আছে। কিন্তু কাব্য জীবনের শুধু শোধক নয়, জীবনের রসায়নও বটে। রবীন্দ্রনাথের গদ্য সাহিত্য যে কাব্যরসে পরিপুষ্ট, তার কারণ সে গদ্য কবির হাতের লেখা।

(৫)

এতক্ষণে বোধ হয় বুঝতে পারছ যে আমি বাংলার ভবিষ্যৎ সাহিত্যের দেহে কি রূপের ও অন্তরে কি গুণের সাক্ষাৎ লাভ কর্‌বার আশা মনে পোষণ করি। আমার বিশ্বাস, সে সাহিত্যে আনন্দ ও আর্ট দুই সমান ফুটে উঠবে—এ আশা করার কি বৈধ কারণ আছে, এখন সে বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা যাক্।

১৯১৮ খৃষ্টাব্দের পয়লা জানুয়ারী তারিখে ইংরাজরাজ যে স্বরাজ্য আমাদের হাতে তুলে দেবেন, এ রকম বিশ্বাস কিংবা এ রকম আশা আমার মনের কোন কোণেও কোন দিন স্থান পায় নি; কেননা আমি সাহিত্যিক হলেও একেবারে বিষয়বুদ্ধিহীন নই। বৈষয়িক লোকেরাই যে আসলে বিষয়বুদ্ধিহীন তার প্রমাণ—আমাদের রাজ-নৈতিক দলের অনেক পাকা মাথার ভিতর এ আশা বাসা বেঁধেছে; অন্ততঃ এঁদের কথায় ত তাই মনে হয়। পরের কথায় নিজের মন কিংবা নিজের কথায় পরের মন ভোলানো আমার ব্যবসা নয়, সুতরাং এ কথা বল্‌তে আমি কিছুমাত্র কুণ্ঠিত নই যে, স্বরাজ্যে আমাদের পূর্ণাভিষেকের এখনও দেরি আছে—এখনও কিছুদিন ধরে আমাদের ইংলণ্ডের কাছে রাজনীতির শিক্ষানবীশি কর্‌তে হবে। তবে এমন কথাও শুনতে পাই যে স্বরাজ্যের ঐ ষোল আনা দাবাটে হচ্ছে রাজনীতির প্রমারার তাড়া। হতে পারে যে আসলে ব্যাপারটা তাই—কিন্তু তাতে আমাদের লাভ কি? রাজনীতির জুয়োখেলে যখন রাজাধিরাজেরাই সর্ব্বস্বান্ত হয়ে পড়েন—তখন আমাদের পক্ষে সে খেলা খেল্‌তে যাওয়া বাতুলতা মাত্র। যদি রুষিয়া ও জার্ম্মণী পরস্পরকে প্রমারার তাড়া না মার্‌তেন তা হলে ইয়োরোপে এই আগুন জ্বলত না এবং তার ফলে এদের

সর্ব্বনাশও হত না। Czar ত ইতিমধ্যেই ফকির হয়েছেন এবং Kaiser ফতুর হবেন;—দু'দিন পরে। আমাদের যখন কোন রকমে হাতের পাঁচ রাখা নিয়ে কথা, তখন আমাদের পক্ষে রাজনীতির বৈঠকে চিৎ-বিস্তি খেলাই বুদ্ধিমানের কর্ম্ম। যখন আমার বিশ্বাস যে, আকাশের চাঁদ খসে কাল আমাদের হাতে এসে পড়্‌বে না, তখন আমি আগামী যুগকে কেন নবযুগ বল্‌ছি সে কথাটা একটু পরিষ্কার করে বলবার চেষ্টা করা যাক্।

ভারতবর্ষ যদিও বর্ত্তমান যুগের রাত পোয়ালেই ক্যানেডা কিংবা অষ্ট্রেলিয়া হয়ে উঠ্‌বে না; তবু তা এমন যায়গায় গিয়ে পৌঁছবে যেখানে আমরা নিজের শক্তিতে আমাদের স্বরাজ্য গড়ে তুল্‌তে পার্‌ব। এর চাইতে সু-খবর আর কি হতে পারে? আমরা এই মোটা কথাটা সদাই ভুলে যাই—যে স্বরাজ্য কিংবা স্বদেশ কোন জাতিই পড়ে পায় নি, সকল জাতিকেই তা নিজ হাতে গড়ে তুল্‌তে হয়েছে। দেশ বল্‌তে খানিকটা মাটি বোঝাতে পারে, কিন্তু সেই মাটিতে একমাত্র ভূমিষ্ঠ হবার কষ্ট স্বীকার কিংবা আরাম উপভোগ করে মানুষে সে দেশকে স্বদেশ করে তুল্‌তে পারে না। স্বদেশ বল্‌তে আমি বুঝি—সেই মহাবস্তু, দেশ নামক মাটির উপর, মানুষে মনপ্রাণ দিয়ে যা গড়ে তোলে। প্রথমটি হচ্ছে জড়-জগতের অন্তর্ভূত, দ্বিতীয়টি মনোজগতের একটা দেশের উপর একটা সমগ্র জাতে মিলে, নিজেদের দেহমনের বাসের জন্য যে ঘর বাঁধে, সেই ঘরই যথার্থ স্বদেশ। এ ঘরের উপকরণ হচ্ছে কৃষি, শিল্প, বেশভূষা, আচার ব্যবহার, কাব্যকলা, দর্শন, বিজ্ঞান ইত্যাদি; অর্থাৎ এ সব উপকরণ মানুষকে নিজ মনে ও নিজ হাতে তৈরি করে নিতে হয়। এ বাসগৃহ একদিনে গড়া যায় না, এবং

একবার গড়ে তারপর চিরদিন আরামে ভোগ-দখলও করা যায় না। প্রতি যুগে এর জীর্ণ অঙ্গ ভাঙ্গতে হয়, আবার নূতন অঙ্গ গেঁথে তুলতে হয়। এবং সেই জাতিকেই মানুষে কৃতী বলে—যাদের হাতে মানুষের এই স্বহস্তরচিত গৃহের উদারতা ও উচ্চতা যুগের পর যুগে ক্রমে বেড়েই চলে। এক কথায় স্বদেশ জিওগ্রাফির নয়—হিষ্টিরির অধিকারভুক্ত। জিওগ্রাফি গড়ে প্রকৃতি, আর হিষ্টিরি গড়ে মানুষে।

এই হিষ্টিরি গড়বার স্বাধীনতাই মানুষের যথার্থ স্বাধীনতা। এ বিষয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবাসীর যে স্বাধীনতা ছিল, বিংশ-শতাব্দীতে তার চাইতে ঢের বেশী থাক্‌বে। লোকে যাকে রাজ-নৈতিক অধিকার বলে, সেটা হচ্ছে আসলে একটা জাতীয় দায়। আস্‌ছে যুগে স্বজাতির শাসন-সংরক্ষণের ভার কতটা জানি নে, কিন্তু অনেকটা ভারতবাসীর ঘাড়ে পড়্‌বে; এর ফলে আমাদের অপেক্ষা তোমাদের কাজের ক্ষেত্র ঢের বেশী বিস্তৃত ও বিচিত্র হবে। ভাগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, "কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে"—জীবনের সকল ক্ষেত্রে তোমরা মানুষের সেই ভগবদ্দত্ত অধিকার লাভ কর্‌বে, অর্থাৎ তোমরা আবার মানুষ হবার অধিকার লাভ কর্‌বে।—এই লাভই ত মানুষের যথার্থ স্বরাজ্য লাভ।

এই বিশ্বাসের বলে আমি আশা কর্‌ছি ভারতবর্ষের এই নব-যুগে তোমাদের জীবন নব-আনন্দে পূর্ণ হয়ে উঠ্‌বে; কেননা স্বাধীনভাবে কাজ কর্‌বার ভিতরই মানুষের আনন্দ, ভোগ কর্‌বার ভিতর আরাম থাক্‌তে পারে—আনন্দ নেই। কাব্য রচনা করে' কবি যে আনন্দ পান, কাব্য পাঠ করে পাঠক সে আনন্দ কখনই পেতে পারেন না। যে জাতি স্বদেশকে একটি মহাকাব্যের মত গড়ে তুল্‌তে ব্রতী হয়, সে

জাতি পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্য্যন্ত একটা তীব্র আনন্দের প্রবাহ অনুভব করে। আমাদের নব মহাভারতের আদিপর্ব্ব রচনার দায় তোমাদের উপরেই বর্ত্তাবে, অতএব তোমাদের জীবন কখনই নিরানন্দ হবে না, যদি না সে দায় তোমরা এড়াতে চেষ্টা করো। সুতরাং সে আনন্দ নবযুগের সাহিত্যে ব্যক্ত হতে বাধ্য।

তার পর তোমাদের পক্ষে, একাগ্রমনে আর্টের চর্চ্চা করাটা আবশ্যক; অতএব অবশ্য কর্ত্তব্য হয়ে পড়্‌বে। মানব সভ্যতার প্রতি অবস্থারই কতকগুলি বিশেষ গুণ ও বিশেষ দোষ আছে, এবং জাতীয় সাহিত্যের সার্থকতা হচ্ছে, সেই গুণের অনুশীলনে ও সেই দোষের নিরাকরণে। যে ডিমোক্রাসির স্তুতিগানে দেশ আজ মুখরিত, সেই ডিমোক্রাসির অশেষ গুণের মধ্যে একটি মহা দোষ হচ্ছে তার ইতরতা। সাধারণতন্ত্র স্বাতন্ত্র্যের বিরোধী। সাম্যবাদীরা মানব-সমাজকে জীবনে সমবস্থ করে খুসী হন্ না, সেই সঙ্গে তাঁরা সকলকে মনেও সমধর্ম্মা করে তুল্‌তে চান; কেননা বৈচিত্রকে তাঁরা বৈষম্যজ্ঞানে নষ্ট কর্‌তে সদাই প্রস্তুত। মনোজগৎকে তাঁরা সমতল ভূমিতে পরিণত কর্‌তে চান,—তাঁদের ধারণা এ পৃথিবীটে গোচারণের মাঠ হলেই তা ভূ স্বর্গ হয়ে উঠ্‌বে। পৃথিবীতে অবশ্য যা শ্রেষ্ঠ তাই অসাধারণ। ডিমোক্রাসি অসাধারণতার বিপক্ষ ব'লে, কাব্য ও কলার পরিপন্থী; কেননা কাব্য ও কলা হচ্ছে শ্রেষ্ঠ মনের সৃষ্টি। ডিমোক্রাসির ইতরতার একমাত্র কাটান হচ্ছে আর্ট; কেননা একমাত্র আর্টের সাহায্যে মানবজাতি তার ভাবের ও কর্ম্মের অভিজাত্য রক্ষা কর্‌তে পারে। সুতরাং নব-যুগের সাহিত্য তার অভিজাত্য রক্ষা কর্‌বার জন্য, সজ্ঞানে আর্টের চর্চ্চা কর্‌তে বাধ্য। আমি সজ্ঞানে বল্‌ছি এই কারণে যে, আমার বিশ্বাস এ যুগের

সাহিত্য গদ্যপ্রধান হয়ে উঠ্‌বে। গদ্য হচ্ছে ব্যবহারিক জীবনের ভাষা—সুতরাং সে ভাষার ইতর হয়ে পড়্‌বার দিকে একটা জন্ম-সুলভ ঝোঁক আছে—এ ঝোঁকের হাত থেকে তাকে বাঁচাবার জন্য লেখকদের সদাসর্ব্বদা সতর্ক ও সচেতন থাক্‌তে হবে। ডিমোক্রাসির যুগে utilitarianism সাধারণের মনের উপর—রাজার মত প্রভুত্ব করে, সুতরাং সে যুগের মানবাত্মার মুক্তির বাণী হচ্ছে art for art's sake যেমন theocracy-র যুগে মুক্তির বাণী হচ্ছে truth for truth's sake. আশা করি তোমাদের "নববাণী" এই নব-যুগের আনন্দ ও আর্টের বাণী হবে। আমার শেষ কথা এই যে, "যোগস্থঃ কুরু কর্ম্মাণি সঙ্গংত্যক্ত্বা ধনঞ্জয়"—গীতার এ আদেশ শুধু যুদ্ধক্ষেত্রে নয়, সাহিত্য-ক্ষেত্রেও শিরোধার্য্য ; কেননা সিদ্ধিলাভের ঐ হচ্ছে একমাত্র উপায়।

রাঁচি
৮ই কার্ত্তিক, ১৩২৪।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

বালাই

—:০:—

মাঘ মাস—শীতটা কমে আসছিল এমন সময়ে বাদলা নামল। এমন দিনে কোথাও যাওয়া আসা করা আরামের না হলেও সেদিন ভোর ছটায় আমাকে গাড়ী ধরতে হ'ল—বাড়ী যেতে হবে। সুখের মধ্যে গাড়ীতে ভিড় ছিল না—একজন মাত্র কথা কবার লোক কামরায় ছিলেন।

লোকটী ইন্‌সিওরেন্সের দালাল। ক্রমে পরিচয় হ'ল ও কথায় কথায় অর্দ্ধেক পথ যে কোথা দিয়ে কেটে গেল তা বুঝতেও পারলাম না। বুঝতে পারলাম যখন নৈহাটী এসে গাড়ী থামল ও সশব্দে গাড়ীর দরজা খুলে একটী হ্যাটকোটধারী ভদ্রলোক সস্ত্রীক সবেগে গাড়ীতে উঠলেন।

লটবহর ওঠানর হাঙ্গামা ও মুটের সঙ্গে বকাবকিতে আমাদের আলাপ স্তম্ভিত হয়ে গেল। ইতিমধ্যে দোর দিয়ে হু হু করে বৃষ্টির ছাঁট ও শীতের হাওয়া গাড়ীর মধ্যে ঢুকছিল। ভদ্রলোকটী বীরের মত দোরের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন—over coat-এর ওপর তাঁর বর্ষাতি মোড়া। ফুঁকো হাওয়া বা বাদলের ধারা তাঁকে একটুও টলাতে পারল না কিন্তু বর্ম্মচর্ম্মহীন আমার বুকটা গুরগুর করে উঠছিল।

গাড়ী ছাড়তে ছাড়তে দালাল বাবুটী নবাগতের সঙ্গে আলাপ সুরু করে দিলেন—"কোথায় যাবেন মশাই ?"

"চাঁদপুর।"

"বহুদূর যে!"

কথায় যোগ দেবার জন্য আমি বলে উঠলাম—"অনুপ্রাসের অট্টহাসি শোনা যাচ্চে", কিন্তু আমার রসিকতার চেষ্টা যে ব্যর্থ হয়েছে চোরা চাহনিতে সে খবরটা জানিয়ে, ভদ্রলোক তাঁর দালাল বন্ধুর দিকে চেয়ে একটু মুচকে হেসে বললেন—হাঁ একটু দূর বটে।

"কিন্তু এমন দিনে বেরোলেন যে? একে দূরের পথ তাতে এই দুর্য্যোগ আবার মেয়েছেলে সঙ্গে রয়েছেন"—

"কি করি মশাই ভাল দিনের জন্য আজ পাঁচ পাঁচ দিন এখানে বসে!"—ভদ্রলোকটীর প্রতি আমার মন প্রসন্ন হতে পারে নি। তাঁকে আঘাত করবার একটা সুযোগ তাই আমি অবহেলা করতে পারলাম না—বললাম "তাই বুঝি বেছে বেছে এই তেরস্পর্শ নিয়ে বেরোলেন?"

তেরস্পর্শ কি বলচেন মশাই!

"আমি বলচি নে—আপনার বন্ধুই বলচেন। দূর দুর্য্যোগ ও দয়িতা মিলে অঙ্কশাস্ত্রের নিয়মেই তেরস্পর্শ হয়েছে আমার কথায় হয় নি।"

ভদ্রলোক একটু মুরুব্বিয়ানা ভাবে হাসতে হাসতে বললেন—"কিন্তু মশাই কি জানেন যে যাত্রার এমন দিন সচরাচর পাওয়া যায় না?"

"না পাওয়া যাবারই কথা। শীতকালের দিনে এমন বাদলা কচিৎ দেখতে পাওয়া যায়। তবে এমন দিন যে যাত্রার পক্ষে এত উপাদেয় তা জানা ছিল না।"

"পাঁজিখানা দেখলে আর ওকথা বলতেন না"—

"না আমি পাঁজি দেখি নি। দরকার হল বেরিয়ে পড়লাম"—

"পাঁজি ফাঁজি দেখেন নি। তাই খামকা বলে দিলেন যে দিনটা খারাপ। নিজে দেখেছি ত পাঁজি, তবু কথাটা শুনে বুকটা ধড়াস্ করে উঠেছে। তেরস্পর্শ এমনি জিনিস।"

"পাঁজি দেখিনি বটে কিন্তু দিনটা সকাল থেকেই দেখে আসচি। জানা ছিল তেরস্পর্শ খুব খারাপ দিন তাই ভাবলাম যে আজ তেরস্পর্শ না হয়ে যায় না বিশেষ আপনার পক্ষে।"

ভদ্রলোক উত্তর করবার আগেই দালাল বাবুটী বললেন—"পাঁজিতে যখন যাত্রা লিখেছে তখন দিন ভাল হতেই হবে। কিন্তু আমি বলছিলাম কি, যে বারটা যেন একটু কেমন কেমন বোধ হচ্চে না দাদা?" মেয়েরা বলে রবিবারে—

আপনিও তাই বলেন নাকি? লেখাপড়া শিখেও ও-সব মেয়েলি শাস্ত্র মানেন আপনি?

দালাল বাবুটি আর কথা কইতে পারলেন না—একেবারে এতটুকু হ'য়ে গেলেন। তাঁর হ'য়ে একটা কথা তাই আমাকে বলতে হ'ল—"মেয়েলী শাস্তর না হয় আপনারা মানলেন না কিন্তু মেয়েরাও যদি পৌরুষী শাস্ত্র না মানেন?"

ভদ্রলোক পরম বিজ্ঞভাবে উত্তর করলেন—"তাতে সুবিধা নেই মশাই তাতে সুবিধা নেই। সুবিধা হচ্চে শাস্ত্র মেনে চলায়। মেয়েরা সেটা বেশ বোঝেন—তাই আমাদের চেয়ে শাস্ত্র তাঁরাই বেশী মানেন। আপনি কি বলেন মশাই?"

ভদ্রলোক তাঁকে এই মধ্যস্থ মানায়, দালাল বাবুটি নিতান্ত আপ্যায়িত হলেন বলে বোধ হল ; তাই তিনি অত্যন্ত তাড়াতাড়ি বলে ফেল্লেন—"নিশ্চয়ই তা আর বলতে।"

"তা হতে পারে কিন্তু সুবিধার হিসাবে যে তাঁরা শাস্ত্র মানেন এ কথা বলা যায় কি ?"

"তবে কি হিসেবে তাঁরা শাস্ত্র মানেন মনে করেন আপনি ?"

"হিসেব ত পড়েই রয়েছে। এই ধরুন আপনার গায় জামাজোড়া যথেষ্ট রয়েছে দূর্য্যোগ আপনাকে পোয়াতে হচ্চে না, কিন্তু ভিজে শাল-খানি জড়িয়ে খালি পায়ে আপনার স্ত্রী দেখুন এখনো কাঁপচেন। সুবিধার হিসাব"—

আমার কথা শেষ করতে না দিয়ে দালাল বলে উঠলেন—না মশাই আপনি যদি আমাদের মেয়েদের জুতো মোজা পরাতে চান তবে আপনার সঙ্গে আমার মতের মিল নেইও হবেও না। পরে ভদ্র-লোকটীর দিকে ফিরে বললেন—"আমি কেবল বলছিলাম যে মেয়ে-ছেলেদের নিয়ে এই দূর্য্যোগ।"

ভদ্রলোক একটু বিরক্ত ভাবেই বলে উঠলেন—"দূর্য্যোগ কি বলচেন মশাই—গাড়ীর মধ্যে আবার দুর্য্যোগ কি ? এ কি গরুর গাড়ী ? আর রবিবার ফবিবার যা বলচেন স্বামীর সঙ্গে যেতে তা বাছতে হয় না।"

"ওঃ তাও ত বটে—ঠিকই ত। স্বামীর সঙ্গে যেতে ত ওসব কিছুই বাছতে হয় না—স্বামীর সঙ্গে সহমরণ পর্য্যন্ত যাওয়া যায় এ ত শুধু সহগমন।"

কথাটা শুনে দালাল হেসে ফেলছিলেন কিন্তু ভদ্রলোকটীকে হটাৎ গম হ'য়ে যেতে দেখে, শেষে এমনি গম্ভীর ভাবে তিনি টাইমটেবল দেখতে আরম্ভ করলেন যে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে আমি সাহস করলাম না। অতঃপর রাণাঘাটে গাড়ী থামলে যখন আমি দু'জনকে নমস্কার জানিয়ে নেমে পড়লাম তখন দু'জনের কেউই আমায় তা ফিরিয়ে দিলেন না।

শ্রীপ্রবোধ ঘোষ।

তোতা কাহিনী।

—:০:—

(১)

এক যে ছিল পাখী। সে ছিল মূর্খ। সে গান গাহিত, শাস্ত্র পড়িত না। লাফাইত, উড়িত; জানিত না কায়দা কানুন কাকে বলে।

রাজা বলিলেন, "এমন পাখী ত কাজে লাগে না, অথচ বনের ফল খাইয়া রাজহাটে ফলের বাজারে লোকসান ঘটায়।"

মন্ত্রীকে ডাকিয়া বলিলেন, "পাখীটাকে শিক্ষা দাও!"

(২)

রাজার ভাগিনাদের উপর ভার পড়িল পাখীটাকে শিক্ষা দিবার।

পণ্ডিতেরা বসিয়া অনেক বিচার করিলেন। প্রশ্নটা এই, "উক্ত জীবের অবিদ্যার কারণ কি?"

সিদ্ধান্ত হইল, সামান্য খড়কুটা দিয়া পাখী যে-বাসা বাঁধে, সে-বাসায় বিদ্যা বেশী ধরে না। তাই সকলের আগে দরকার ভালো করিয়া খাঁচা বানাইয়া দেওয়া।

রাজপণ্ডিতেরা দক্ষিণা পাইয়া খুসি হইয়া বাসায় ফিরিলেন।

(৩)

স্যাকরা বসিল সোনার খাঁচা বানাইতে। খাঁচাটা হইল এমন আশ্চর্য্য যে, দেখিবার জন্য দেশ বিদেশের লোক ঝুঁকিয়া পড়িল। কেহ বলে, "শিক্ষার একেবারে হদ্দমুদ্দ!" কেহ বলে "শিক্ষা যদি নাও হয়, খাঁচা ত হইল। পাখীর কি কপাল!"

স্যাকরা থলি বোঝাই করিয়া বক্‌শিস্ পাইল। খুসি হইয়া সে তখনি পাড়ি দিল বাড়ির দিকে।

পণ্ডিত বসিলেন পাখীকে বিদ্যা শিখাইতে। নস্য লইয়া বলিলেন "অল্প পুঁথির কর্ম্ম নয়।"

ভাগিনা তখন পুঁথি-লিখকদের তলব করিলেন। তারা পুঁথির নকল করিয়া এবং নকলের নকল করিয়া পর্ব্বতপ্রমাণ করিয়া তুলিল। যে দেখিল সেই বলিল, "সাবাস! বিদ্যা আর ধরে না!"

লিপিকরের দল পারিতোষিক লইল বলদ বোঝাই করিয়া। তখনি ঘরের দিকে দৌড় দিল। তাদের সংসারে আর টানাটানি রহিল না।

অনেক দামের খাঁচাটার জন্য ভাগিনাদের খবরদারির সীমা নাই। মেরামত ত লাগিয়াই আছে। তারপরে ঝাড়া মোছা পালিস করার ঘটা দেখিয়া সকলেই বলিল, "উন্নতি হইতেছে!" লোক লাগিল বিস্তর এবং তাদের উপর নজর রাখিবার জন্য লোক লাগিল আরো বিস্তর। তারা মাস-মাস মুঠা-মুঠা তন্‌খা পাইয়া সিন্দুক বোঝাই করিল।

তারা এবং তাদের মামাতো খুড়তুতো মাসতুতো ভাইরা খুসি হইয়া কোঠা বালাখানায় গদি পাতিয়া বসিল।

(৪)

সংসারে অভাব অনেক আছে, কেবল নিন্দুক যথেষ্ট। তারা বলিল, "খাঁচাটার উন্নতি হইতেছে কিন্তু পাখীটার খবর কেহ রাখে না।"

কথাটা রাজার কানে গেল। তিনি ভাগিনাকে ডাকিয়া বলিলেন, "ভাগিনা, এ কি কথা শুনি?"

ভাগিনা বলিল, "মহারাজ, সত্য কথা যদি শুনিবেন তবে ডাকুন স্যাকরাদের, পণ্ডিতদের, লিপিকরদের, ডাকুন যারা মেরামত করে এবং মেরামত তদারক করিয়া বেড়ায়। নিন্দুকগুলো খাইতে পায় না বলিয়াই মন্দ কথা বলে।"

জবাব শুনিয়া রাজা অবস্থাটা পরিষ্কার বুঝিলেন আর তখনি ভাগিনার গলায় সোনার হার চড়িল।

(৫)

শিক্ষা যে কি ভয়ঙ্কর তেজে চলিতেছে রাজার ইচ্ছা হইল স্বয়ং দেখিবেন। একদিন তাই পাত্রমিত্র অমাত্য লইয়া শিক্ষাশালায় তিনি স্বয়ং আসিয়া উপস্থিত।

দেউড়ির কাছে অমনি বাজিল শাঁখ ঘণ্টা ঢাক ঢোল কাড়ানাকড়া তুরী ভেরি দামামা কাঁশি বাঁশি কাঁসর খোল করতাল মৃদঙ্গ জগঝম্ফ। পণ্ডিতেরা গলা ছাড়িয়া টিকি নাড়িয়া মন্ত্রপাঠে লাগিলেন। মিস্ত্রি মজুর স্যাকরা লিপিকর তদারকনবিশ আর মামাতো পিসতুতো খুড়তুতো এবং মাসতুতো ভাই জয়ধ্বনি তুলিল।

ভাগিনা বলিল, "মহারাজ, কাণ্ডটা দেখিতেছেন!"

মহারাজ বলিলেন, "আশ্চর্য্য! শব্দ কম নয়!"

ভাগিনা বলিল, "শুধু শব্দ নয় পিছনে অর্থও কম নাই।"

রাজা খুসি হইয়া দেউড়ি পার হইয়া যেই হাতিতে উঠিবেন এমন সময়, নিন্দুক ছিল ঝোপের মধ্যে গা-ঢাকা দিয়া, সে বলিয়া উঠিল, "মহারাজ, পাখীটাকে দেখিয়াছেন কি?"

রাজার চমক লাগিল, বলিলেন, "ঐ যা! মনে ত ছিল না! পাখীটাকে দেখা হয় নাই।"

ফিরিয়া আসিয়া পণ্ডিতকে বলিলেন, "পাখীকে তোমরা কেমন শেখাও তার কায়দাটা দেখা চাই!"

দেখা হইল। দেখিয়া বড় খুসি! কায়দাটা পাখীটার চেয়ে এত বেশি বড় যে, পাখীটাকে দেখাই যায় না, মনে হয় তাকে না দেখিলেও চলে। রাজা বুঝিলেন, আয়োজনের ত্রুটি নাই। খাঁচায় দানা নাই পানি নাই, কেবল রাশি রাশি পুঁথি হইতে রাশি রাশি পাতা ছিড়িয়া কলমের ডগা দিয়া পাখার মুখের মধ্যে ঠাসা হইতেছে। গান ত বন্ধই—চীৎকার করিবার ফাঁকটুকু পর্য্যন্ত বোজা। দেখিলে শরীরে রোমাঞ্চ হয়।

এবারে রাজা হাতিতে চড়িবার সময় কান-মলাবর্দ্দারকে বলিয়া দিলেন নিন্দুকের যেন আচ্ছা করিয়া কান মলিয়া দেওয়া হয়।

(৬)

পাখীটা দিনে দিনে ভদ্র দস্তুর মত আধমরা হইয়া আসিল। অভিভাবকেরা বুঝিল বেশ আশাজনক। তবু স্বভাবদোষে সকালবেলার

আলোর দিকে পাখী চায় আর অন্যায়রকমে পাখা ঝট্‌পট্‌ করে। এমন কি, এক-একদিন দেখা যায় সে তার রোগা ঠোঁট দিয়া খাঁচার শলা কাটিবার চেষ্টায় আছে।

কোতোয়াল বলিল, "একি বেয়াদবি!"

তখন শিক্ষামহালে হাপর হাতুড়ি আগুন লইয়া কামার আসিয়া হাজির। কি দমাদ্দম পিটানি! লোহার শিকল তৈরি হইল পাখীর ডানাও গেল কাটা।

রাজার সম্বন্ধীরা মুখ হাঁড়ি করিয়া মাথা নাড়িয়া বলিল, "এ রাজ্যে পাখীদের কেবল যে আক্কেল নাই তা নয়, কৃতজ্ঞতাও নাই।"

তখন পণ্ডিতেরা এক হাতে কলম এক হাতে সড়কি লইয়া এম্‌নি কাণ্ড করিল যাকে বলে শিক্ষা!

কামারের পসার বাড়িয়া কামার-গিন্নির গায়ে সোনাদানা চড়িল এবং কোতোয়ালের হুসিয়ারি দেখিয়া রাজা তাকে শিরোপা দিলেন।

(৭)

পাখীটা মরিল।

কোন্‌কালে যে কেউ তাহার করিতে পারে নাই। নিন্দুক লক্ষ্মী-ছাড়া রটাইল, "পাখী মরিয়াছে।"

ভাগিনাকে ডাকিয়া রাজা বলিলেন, "ভাগিনা, এ কি কথা শুনি?"

ভাগিনা বলিল, "মহারাজ, পাখীটার শিক্ষা পুরো হইয়াছে।"

রাজা শুধাইলেন, "ও কি আর লাফায়?"

ভাগিনা বলিল, "আরে রাম!"

"আর কি ওড়ে?"

"না।"

"আর কি গান গায়?"

"না।"

"দানা না পাইলে আর কি চেঁচায়?"

"না।"

রাজা বলিলেন, "একবার পাখীটাকে আন ত, দেখি।"

পাখী আসিল। সঙ্গে কোতোয়াল আসিল, পাইক আসিল, ঘোড়-সওয়ার আসিল। রাজা পাখীটাকে টিপিলেন। সে হাঁ করিল না, হুঁ করিল না। কেবল তার পেটের মধ্যে পুঁথির শুকনো পাতা খস্‌-খস্‌ গজ্‌গজ্‌ করিতে লাগিল।

বাহিরে নববসন্তের দক্ষিণ হাওয়ায় কিশলয়গুলি দীর্ঘনিঃশ্বাসে মুকুলিত বনের আকাশ আকুল করিয়া দিল।

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।